তৃতীয় অধ্যায়

গয়নাবড়ি বা গহ্নাবড়ি

৩.১ বড়ি শব্দের ব্যুৎপত্তি : গয়নাবড়ি নামকরণের তাৎপর্য

৩.২ গয়নাবড়ির উদ্ভব ইতিহাসের অনুসন্ধান

৩.৩ গয়নাবড়ির অঞ্চল

৩.৪ গয়নাবড়ির পারিবারিক ঐতিহ্য ও শিল্পী পরিচয়

৩.১ বড়ি শব্দের ব্যুৎপত্তি : গয়নাবড়ি নামকরণের তাৎপর্য

বড়ি যে অতি প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে এর উল্লেখ দেখানো হয়েছে। এর থেকে প্রমাণ হয় প্রাচীন বাংলায় এর প্রচলন ছিল। কিন্তু এখানে আলোচ্য বিষয় হল বড়ি শব্দের ব্যুৎপত্তি বড়ি শব্দটি বাংলা শব্দ সংস্কৃত শব্দ বটী থেকে এর উদ্ভব। প্রাকৃত তে এর উল্লেখ রয়েছে বড়ি। হিন্দিতেও এর প্রচলন রয়েছে। সেখানেও এটি বড়ি নামে প্রচলিত। ভোজপুরিতে 'বড়ি' নামে পরিচিত। পশ্চিমবাংলায় প্রায় সমস্ত জেলাতে এবং পশ্চিমবাংলার পার্শ্ববর্তী কিছু রাজ্যে এর প্রচলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্র, বিহার, উড়িষ্যা সমস্ত যায়গাতেই বড়ি নামেই পরিচিত। তবে আগে 'বড়া' না আগে 'বড়ি' সেইকথা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। 'বড়ি' কিন্তু 'বঠিকা' অর্থাৎ 'ঔষধগুলি' এই অর্থে প্রাচীন কালে ব্যবহার হতো। এখনও আয়ুর্বেদ্ শাস্ত্রে এর প্রচলন রয়েছে। সেদিন থেকে বিচার করলে বড়ি আগে। আবার খাদ্যবস্তুতে হিসাবে বিচার করলেও 'বড়ি' আগে, যখন থেকে মানুষ সংরক্ষণের উপায় জেনেছে ঠিক তখন থেকে খাদ্যবস্তুকে রোদে শুকিয়ে সঞ্চয় করে রেখেছে ভবিষ্যতের জন্য। সেই ধারনা থেকেই 'বড়ির' উৎপত্তি।।

বড়ি শব্দের কিন্তু আভিধানিক অর্থ রয়েছে। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (দ্বিতীয়) হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বড়ি' শব্দের অর্থ লিখেছেন- ''বড়ি'' - ড়ী'' বি [সংকটী প্রাবতী বাড়ী — ড়ি ; হি বড়ী] -ডালবাটা, চালকুমার বাটিকার খাদ্য বিশেষ।''[১]

এখানে লেখক বড়ি বলতে সরাসরি উল্লেখ করেছেন ডালবাটা, এবং ডালবাটা তৎসহযোগে কুমাড়া দিয়ে বাটিকার মত খাদ্য। বাঙলা 'ভাষার অভিধানে' জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 'বড়ি' শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন-

> ''বড়ি''- বড়ী, [হিং/সং-বটী) (বড়া শব্দের ক্ষুদ্রত্ব বাচক) বি, পিষ্ট দাউল ও মশলা সংযোগে প্রস্তুত ছোটবড় বটিকাকার খাদ্য বি:/ ''সুন্দরী গন বড়িনামে যে সুস্বাদু ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে''- বঙ্কিম (লোকরহস্য)।[২]

লোকরহস্য তে বঙ্কিম চন্দ্র এই বড়ির যথার্থ মনে করেছেন- এখানে তিনি বড়িকেও যেমন সুস্বাদু বলেছেন তেমনি বড়ি যারা বানান তাদের 'সুন্দরী' বলেছেন অর্থাৎ এখানে বোঝা যায় বড়ি তৈরির ক্ষেত্রে মেয়েদের একছত্র অধিকার রয়েছে। 'ব্যাবহারিক শব্দকোষ বাংলা ভাষা অভিনব অভিধানে' - শ্রী অনিলচন্দ্র ঘোষ বিশ্লেষন করেছেন।

''বড়ি, ড়ী - [সংবটিকা] বি বাটিকা, গুলি ; ছোটবড়া, ফেটানো ডালের রৌদ্র শুষ্ক ফাঁপা গুলি, (ফুলবড়ি, বড়ির ঝোল)''[৩]

এখানে শ্রী অনিলচন্দ্র ঘোষ বলেছেন- ফেটানো ডালের রোদে শুকোনো হাল্কা নরম অর্থাৎ ফাঁপা গুলি অর্থাৎ বড়ি- বড়ির প্রধান উপকরণ যে ফেটানো ডাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'চলন্তিকা' বাংলা ভাষায় অভিধানে রাজ শেখর বসু বলেছেন।

(বড়ি] <বটিকা, গুলি (ঔষধের) ছোট বড়া। পিষ্ট ডালের শুস্ক পিণ্ড)[৪]

এখানে বড়িকে ছোট বড়ার রুপান্তর বলা হয়েছে। বাঙ্গলা শব্দকোষ, যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'বড়ি' শব্দের যে বিশ্লেষন করেছেন সেটি এইরকম -

বড়া- ষ্য (সংবটক) বড়ী- ষ্য (সংবটী)

দাইল বাটার ছোট বড়া রৌদ্রে শুখানা ; বড়ী দেওয়া- দাইল বাটার বড়ী নির্মান করা। কুমাড়াবড়ী- বিরী কলাই বাটার সহিত ছাঁচি কুমড়া কোরা মিশাইয়া বড়ী। ফুলবড়ী - যে বড়ী ফুলিয়া ওঠে''।[৫]

নতুন বাঙ্গলা অভিধানে শ্রী আশুতোষ দেব বলেছে ''বড়ি, বড়ি, / বট্টী, গুলি / বটী - শব্দদর্শন, (বহুব্রীহি)''[৬]

সমস্ত আভিধানিক অর্থ প্রায় একই কেউ বলেছেন- 'ফেটানো ডালের রৌদ্র শুষ্ক ফাঁপাগুলি' কেউ বলেছেন, 'পিষ্ঠ দালের শুষ্ক পিন্ত। 'ডালবাটা , চালকুমড়া বটিকার খাদ্য বিশেষ'- সবই একই অর্থ বহন করে।'

কবি কঙ্কনচন্তীতে

কুসুমবড়ী বলতে বুঝিয়েছে -

''কুসুমজবড়ী- সংকুসুম/ এই ফুলের বীজ দিয়া যে বটী প্রস্তুত হয়।''[৭]

''ফুলবড়ি- ফুল + বড়ি - ফুলের মতন ফুল্ল ফুলো ফাঁপা কোমল বড়ি''।[৮]

ড: করন এর ভাষায়-

'বড়িয়া' শব্দ থেকে 'বড়ি' শব্দটি এসেছে এটি প্রত্ন বাংলার শব্দ- এর অর্থ খুব তবে বলা যায় বড়ি শব্দটি 'বড়িয়া' শব্দের মর্মার্থ কে বহন করে। স্বাদে নিজেও যেমন সুন্দর ঠিক তেমনি ভাবে অন্য খাদ্য কে সুস্বাদু করে তোলার ক্ষমতা রাখে। বড়ির ব্যুৎপত্তি গতঅর্থ যাই হোক না কেন বাঙালির রান্না ঘরে এর একটা আলাদা স্থান রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভোজন রসিক মানুষ মাত্রই বড়ির গুনমুগ্ধ ভক্ত তাই বড়ি যে 'বড়িয়া' তা বলা অত্যুক্তি হবে না।

কুসুমবড়ি, ফুলবড়ি, বাতাসাবড়ি, জিলাপি বড়ি- সমস্ত বড়ির ই নামকরণের পিছনে একটি মানে নিশ্চয়ই রয়েছে ফুলের মত হালকা ও সাদা বলে ফুলবড়ি। জিলাপির প্যাচযুক্ত বড়ি বলে জিলাপি বড়ি, বাতাসার মত দেখতে তাই বাতাসা বড়ি। লোকসংস্কৃতির উপাদানের দিকে চোখ ফেরালেই বোঝাযাবে এর নামকরণ খুবই সাধারণ এবং মানানসই।

তেমনি গয়নাবড়িও 'বঙ্গমাতার ঝাঁপিতে অমূল্য রত্ন'। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন এর 'শিল্পনৈপুন্য বিস্ময়জনক' অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'বড়ির নক্সাগুলি শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন'। অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রথমে বলেছেন 'চমৎকার ডিজাইন'- তার পর বলেছেন 'আলঙ্কারিক নকশা যা ডালবাটার মতো একটি দুরূহ মাধ্যমের সাহায্যে ফোটানো হয়েছে। চারজন শিল্পাবোদ্ধাই ডিজাইন বা নক্সার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন।

আর এই নক্সার মধ্যেই এর নামকরণের অন্তর্হিত রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। স্থানীয়ভাবে কখনো এটি 'গয়নাবড়ি' 'গহনাবড়ি' আবার কখনো নক্সাবড়ি। গয়নাবড়ির মোটিফ বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে এতে তিন ধরনের নক্সা রয়েছে - ১) আলপনার নক্সা, ২) অলংকার বা গহনার নক্সা, আর ৩) প্রকৃতিবস্তু নির্ভর নক্সা।

গয়নাবড়ির মুকুট

ডালবাটার মন্ড ফেটিয়ে চোঙ এর চকিত চক্করে বানিয়ে ফেলেন গয়না নক্সার আদলে বড়ি হাতের নিয়ন্ত্রিত চক্রাবর্তে বড়ির মুখে ফুঠে ওঠে ভাষা। মেয়েদের আবহমান কালের চিরায়ত গয়না বা গহনা প্রীতি থেকেই এই ধরনের নামকরণ। কখনো বড়িতে ফুঠে ওঠে হাতের বালা, কখনো সিঁথির সিঁদুরের মাঝের টিকলি বা সিঁথি। কখোনো সোনার কাঁটা আবার কখনো গলার হার, নেকলেশ, মাকড়ি, মাথার মুকুট। শিল্পি শুভাপ্রসন্ন সাক্ষাৎকারে বলেছেন-

> ''কৃষ্ণের মাথার মুকুটের যে, নক্সা- যে চিরাচরিত ডিজাইন ময়ুরের পাখনার যে লাবণ্য ধরা পড়ে, গয়নাবড়ির ডিজাইনে ''[১০]

গয়নাবড়ির হার

হাতের মুঠোর চাপে চোঙের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা সরু সুতোর মতো ডালবাটার ধারা বঙ্গললনার হাতের লীলায়িত ভঙ্গিমায় গহনার রুপ পায়।-

এই ডিজাইন স্বর্ণকারের নিখুঁত কলা নয় কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে একটি ছন্দিত রমত্যা, Novelty। এই ছন্দিত রম্যতা লাবণ্য বাংলা দেশের মেয়েদের জন্মগত

অধিকার। এই গয়না কিন্তু পরার জন্য নয়। খাওয়ার জন্য। প্রিয়জন কে খুশী করার জন্য আত্মীয় স্বজনের মন পাওয়ার জন্য। সোনার মত বহু মূল্যবান ধাতু কিন্তু এর উপকরণ নয়। এর উপকরণ গ্রামের চাষীর ক্ষেতে বোনা কলাই ডাল। এতে কোন বিশেষ নিয়মের বা কারুকৃতের প্রয়োজন হয়না স্বর্নশিল্পির মত নিয়ম মেনে কাজ শিখতে হয় না এটি বানাতে প্রয়োজন পরম্পরাগত দক্ষতা ও ঐকান্তিক চেষ্টা এবং অবশ্যই ভালবাসা - এরই - দ্বারা অদ্ভুত সুন্দর ভাবে ফুটে ওঠে বড়ির গহনা-গয়নাবড়ি।

আবার ফুলের গয়নার সাথে এর এক অপূর্ব মিল রয়েছে। বাঙলা দেশের মালাকাররা সরু তারের উপর ফুল বসিয়ে নানা ধরনের গয়না বানান। সেই সমস্ত ফুলের গয়না বাঙালিরা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করে থাকেন। বিশেষ করে ফুলশয্যা নববধূর সাজে এবং অন্নপ্রাশনে ছোট্ট শিশুটি কে সাজানোর জন্য এর প্রচলন রয়েছে। অনেক পরিবারে সাধভক্ষণের সময় ফুলের গয়নার ব্যবহার দেখা যায়। মন্দিরের দেববিগ্রহের জন্যেও ফুলের গয়না ব্যবহৃত হয়। এই ফুলের গয়নার যে সমস্ত আকার তার সাথে গয়নাবড়ির আকারের বেশ মিল পাওয়া যায়। এই ফুলের গয়নার সাথে অনেক ধরনের যাদুবিশ্বাস ও সংস্কার লুকিয়ে রয়েছে বিবাহিত মেয়েরা ফুলের গয়না পড়লে আরো বেশি রমণীয় হবে এবং রমণীয়তা নারীর বৈবাহিক সম্পর্কের একমাত্র সেতু। বৈধব্য আসলে ফুলের গয়না একেবারেই ছোঁয়া বারন। আবার শুধু মাত্র সাদা ফুল নয় তার মধ্যে লালের ছোঁয়া অবশ্যই থাকবে। এই ফুলের গয়না বা এমনি গয়না এই সবের মধ্যে পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ মানসিকতার সঙ্গে জাদুবিশ্বাস একাকার হয়ে গেছে।

এ বিষয়ে আর একটা জিনিস উল্লেখ করা যেতে পারে খ্রীষ্টান মেয়েদের মধ্যে সাদা ফুলের গয়না বিয়ের সময় অবশ্যই পরতে হয়। কিন্তু যদি কনে ডির্ভোসি হয় তা হলে তার ফুলের গয়নার রঙ হবে কমলা। এখানে সাদা হল কুমারত্বের প্রতীক। তাই ফুলের গয়না সাথে শুধু বাঙালি রমণী নয় বিভিন্ন ধর্মের এবং বিভিন্ন প্রদেশের রমণীর বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। ফুলের গয়নার মধ্যে মাথার মুকুট, হাতের বাজু ও খোঁপার ফুলের কাঠার সঙ্গে বিশেষ মিল পাওয়া যায়।

গয়নাবড়ির কানের দুল

সোনার গহনার সুক্ষ থেকে সুক্ষতম কাজ যতদুর সম্ভব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে গাঁয়ের রমণীরা তাদের হাতের চাপে লিলায়িত ভঙ্গিমায় ফুটে ওঠে কানের পাশা, মাথার মুকুট, বাজুবন্দ, সীতাহার লকেট ইত্যাদি। তাই গয়না বড়ি নামকরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমার ধারনা গহনাপ্রিয় রবণীর মনের মধ্যে গয়নার নক্সা বিশেষভাবে নিহিত থাকে, গয়না বড়ির জন্মলগ্নে এই নক্সাই বাঙময় হয়ে উঠেছিল।

ব্রতের আলপনার অনুকরণও যেমন গয়নাবড়িতে দেখা যায় ঠিক তেমনি আধুনিক কিছু ডিজাইন এর অনুকরণও এর মধ্যে দেখা যায়। কোথাও ফুটে ওঠে কলকা, জোড়া মাছ, নৃত্যরতা ময়ূর। শাঁখ এবং জ্যামেতিক নক্সা। এই ধরনের ডিজাইনের জন্যই এর অপর নাম নক্সাবড়ি। এর রুপই যে এর নামে ব্যঞ্জনা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এই রুপের মহিমাই নামের প্রতিভাস যা সমস্ত বড়িপ্রেমীকে মুগ্ধ করে এবং শিল্পিদের নতুন সৃষ্টির অনুপ্রেরণা যোগায়।

গয়নাবড়ির লকেট

৩.২ গয়নাবড়ির উদ্ভব ইতিহাসের অনুসন্ধান

গয়নাবড়ির উদ্ভবের ইতিহাস অত্যন্ত জটিল। কারণ আমরা জানি সংস্কৃতির যেকোন উপাদান সৃষ্টির নির্দিষ্ট কোন স্থান কাল বা পাত্র হয় না। এর সৃষ্টির পিছনে ব্যাষ্টির চেতনা ও সমষ্টির আবেগ বিধৃত থাকে। তাই ঠিক নির্দিষ্ট ভাবে কবে থেকে এর উদ্ভব বা বিকাশ তা বলা যায় না। তবে পারিপার্শ্বিক তথ্য, প্রমান ও প্রেক্ষিত থেকে অনুমান করা যায়।

'বড়ি' যে অতিপ্রাচীন এক খাদ্যবস্তু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মধ্যযুগে বাঙালির খাদ্যে এর বিশেষ প্রচলন আমাদের চোখে পড়ে। মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও সামাজিক চেতনার প্রকাশ। সেখানে বড়ির উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের প্রচুর নিদর্শণ রয়েছে। বড়িকে আমিষ নিরামিষ সমস্ত রান্নাকে চমকপ্রদ করে তোলার একটা মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সংরক্ষণের ভাবনা থেকেই যে বড়ির উৎপত্তি সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। বড়ি সাধারণত শীতকালীন খাবার কিন্তু সারা বছর ধরেই রান্নায় ব্যবহার হয়। এবং শীতকালীন শস্য থেকেই এর উৎপত্তি। যেমন কুমড়োর বড়ি, কলাইডালের বড়ি, মসুরের বড়ি। তখনকার দিনে সারা বছর ধরে চালকুমড়ো খাবার মতো সংরক্ষক বা প্রিজারভেটিভ কিছুই ছিলনা। কিন্তু রৌদ্রে শুকানো ছিল একমাত্র আদি ও অকৃত্রিম পদ্ধতি। সারাবছর ধরে চালকুমড়ো খাবার জন্য ডালের সঙ্গে মিশিয়ে মশলা দিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হত। বিভিন্ন বড়ির ক্ষেত্রে এই কথাটিই খাটে। প্রাচীনকালে এইভাবেই বড়ির উদ্ভব হয়েছিল বলে আমাদের বিশ্বাস।

নতুন কিছু সৃষ্টির পিছনে নারীর মুখ্য ভূমিকা কিন্তু অনেক। প্রাচীনকাল থেকেই এটি অতি সত্যকথন। পারিবারিক পরিসরে নারীর সৃষ্টিশীলতা অনন্ত প্রসারী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয়তো আলাদা করে মূল্য পায়না। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই তার সৃষ্টি সমাজে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। এভাবেই নারী আমাদের কৃষ্টি আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে পূর্ণ করেছে। আমাদের ঘর গেরস্থালি

সাজানো, পোশাক, খাদ্য তৈরি, হাতের কাজ, লৌকিক সামাজিক উৎসব উদ্‌যাপন, এমনকি মাঠে ঘাটে রুজি রোজগারে তার গৌরবময় অবদান অনস্বীকার্য। ধুলোমলিন জীবনের জীর্ণ উপকরণ থেকে তারা অতি সহজলভ্য বস্তুর সাহায্যে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরি করে ফেলেন নানা ধরনের শিল্পকর্ম। এই সৃষ্টির পশ্চাতে কোন বানিজ্যিক লেনদেনের স্থান নেই, আছে কেবল প্রিয়জনের জন্য ভালবাসা ও ব্যবহারিক প্রয়োজন।

ঐতিহ্যের ধারায় বাংলার নারী সাংসারিক কাজের অবসরে, বিশ্রামলাভের ফাঁকে অনেকরকমের শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে চলে। শতাব্দীর পর শতাব্দীর কালপ্রবাহে মা থেকে কন্যা থেকে পৌত্রী, হস্তান্তরিত হয়ে থাকে এই মেয়েলি শিল্প কর্মগুলি।

শিল্পকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে শিল্পকলা হল মানব মনের সচল প্রকাশ। মেয়েলি শিল্পকর্ম গুলিতে নারী মননের প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে। এর সঙ্গে অবশ্যই এর ব্যবহারিক দিক রয়েছে। এক্ষেত্রে মেয়েদের মধ্যে ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ ছিলনা। ধনী সম্ভ্রান্ত উচ্চ নীচ ইত্যাদি ভাদ কোনকালে পরিলক্ষিত হয়নি। জাতধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ সমাজের মেয়েদের দ্বারাই এগিয়ে চলেছে লোকসৃষ্টি যুগ থেকে যুগান্তরে -

> সূত্র ৮।। ''লোকসংস্কৃতি শ্রেণী ঘটিত নয়, লোক-সৃষ্টিও। কিন্তু শিক্ষিত অভিজাতেরা, বিশেষ করে পুরুষেরা লোকসৃষ্টির উপভোক্তা নয়, রচয়িতা তো নয়ই। গরিবেরা অশিক্ষিত - অল্পশিক্ষিতরা গ্রামের মানুষেরা - শ্রেণী নির্বিশেষে মেয়েরা লোকসৃষ্টির ধারক ও বাহক। এই ঘটনা লোকসৃষ্টির সৌন্দর্য্য তত্ত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে।'' [১১]

রন্ধনও একটি শিল্প। যে শিল্প একান্ত মহিলা মহল দ্বারাই লালিত ও পালিত হয়ে থাকে। প্রাচীন বাংলায় এর প্রচলন বেশি ছিল প্রত্যেক গৃহস্তের বাড়িতে গৃহিনী নিজেই রান্নার ভার গ্রহণ করতেন এবং কন্যা ও পুত্রবধূদের রান্নার রীতিমত শিক্ষা দিতেন। পুরুষ পাচক থাকলে সেই বাড়িতে নিমন্ত্রণ নিতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অপমানিত বোধ করতেন। পাচক থাকলেও মূল নিয়ন্ত্রণ থাকে কত্রীর হাতেই। তাই অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে রোজকার খাবারে এবং আতিথেয়তায় গৃহিনীর থাকে কড়া নজর।

যার বাড়ির রান্না যত ভাল এবং পরিবেশন যত সুন্দর সেই গৃহিণীর প্রশংসা সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, তাই প্রতিনিয়তই খাদ্যবস্তুতে রকমারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতেই থাকে। আবার উপহার দেওয়া ছিল সেকালে সম্ভ্রান্ত বাড়ির রেওয়াজ। সেই উপহার হবে একেবারে নিজস্ব সব থেকে আলাদা। এই উপহারের মাধ্যমেই বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীর সুনামও

ছড়িয়ে পড়ত। তাই উপহারের মধ্যেও স্বকীয়তা বজায় থাকত। এই অভিনব স্বকীয়তার হাত ধরে অনেক লোকশিল্পের সৃষ্টি হয়েছে - নক্সীকাঁথা, সন্দেশের ছাঁচ, আমসত্ত্বের ছাঁচ, রকমারি পিঠেপুলি, এমনকি গয়নাবড়ি। এখানে একটু বলার বিষয় যে মেয়েরাই কিন্তু প্রকৃত লোকশিল্পের ধারক ও বাহক। তারা যেমন কোনেখোঁপা, জোড়াখোঁপা, জিলিপিখোঁপা, পদ্মখোঁপা, পাটিখোঁপা, জলতরঙ্গ - প্রভৃতি নামের চুল বাঁধত তেমনি আসামান্য মাদুর তৈরি করে রাষ্ট্রপতি পুরষ্কার পেয়েছেন। (মেদিনীপুর দুইনারী পুষ্পরানী জানা ও সরজুবালা গিরি)। শোলা শিল্পে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন কাত্যায়নী মালাকার (কাটোয়া)।

ঠিক এমনিভাবেই মেদিনীপুর জেলার সম্ভ্রান্ত মেয়ে-বউদের হাতে সৃষ্টি হয়েছে গয়নাবড়ি। বড়ি দেবার প্রচলন তো সারা বাংলা জুড়েই রয়েছে। কিন্তু গয়নাবড়ি একান্ত মেদিনীপুর জেলারই। এই বড়ির উদ্ভবের বেশ কিছু দিক নির্দিষ্ট করা গেছে -

১) প্রিয়জনকে খাদ্যবস্তু উপহার দেবার ইচ্ছা

২) প্রিয়জনের কাছ থেকে প্রশংসা প্রাপ্তির আকাঙ্খা, অবসর বিনোদন,

৩) মনের কথা স্বামী / প্রিয়জনকে জানানো।

মেদিনীপুর অঞ্চলে মাহিষ্য পরিবারের বাস বেশি। পূর্ববঙ্গীয় অধিবাসীদের অধিক্য কম। পূর্ববঙ্গীয়দের তুলনায় এদেশীয় মাহিষ্যদের মধ্যে বড়ির প্রচলন বেশি। এবং পূর্ব মেদিনীপুরের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে কলাই-এর উৎপাদনও বেশি। তাই বড়ি উৎপাদন এখানে বেশি। এরফলে উপহার হিসাবে এই অঞ্চলের বউ-মেয়েরা বড়িকেই বেশি প্রাধান্য দেন।

মেদিনীপুরের তমলুক অঞ্চল হল গয়না বড়ির পীঠস্থান। প্রাচীনকাল থেকেই এটি ঐতিহ্যমন্ডিত শহর বা বন্দর। বিভিন্ন জনজাতির বাস এখানে তাই এখানে মিশ্রসংস্কৃতির ধারা প্রবহমান। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণী থেকে জানা যায় ঐখানকার অধিবাসীরা অতিথি পরায়ন, দৃঢ় ও সাহসী ছিল।[১৩]

জিলিপি বড়ি

অতিথি পরায়নতার পরম্পরা ও তাদের উপহার দেবার প্রবণতা আজও রয়েছে। উপহারকে আরো সুন্দর করার প্রয়াসে - বাতাসাবড়ি, ফুলবড়ি - ধীরে ধীরে বিবর্তনের ধারায় আড়াই প্যাঁচের চোঙপুঁলির সাহায্যে একবার হাত ঘুরিয়ে তৈরি। এটি জিলিপির অনুকরণের প্রথম ধাপ। এরপর আসে জিলিপি বড়ি। হাল্কা দুএকটি প্যাঁচের সাহায্যে তৈরি।

এরপর আসে অমৃতি বড়ি, মিষ্টি অমৃতির অনুকরণে আড়াই প্যাঁচ ও অমৃতির প্যাঁচের মিলিত প্রয়াসে তৈরি। দেখতে একদম অমৃতির মতনই।

অমৃতি বড়ি

এরপরই আঙিনার আলপনা ও গহনার ডিজাইনের অনুকরণে তৈরি গয়নাবড়ি। আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের উপহার দেবার জন্য এর উদ্ভব।

গয়না বড়ি

শোনাযায় ময়নাগড়ের রাজপরিবারের মেয়েদের হাতেই এর প্রথম উৎপত্তি। ময়নাগরের রাজা এই বড়ি উপঢৌকন হিসাবে পাঠাতেন। এই পরিবারের কথা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। তবে বাতাসা বড়ি বা ফুলবড়ির ও নক্সার বৈবাহিক বন্ধনেই যে গয়নাবড়ির সৃষ্টি এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গয়না বড়ি উদ্ভবের পর্যায়টি যদি একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায় তাহলে এমন হবে -

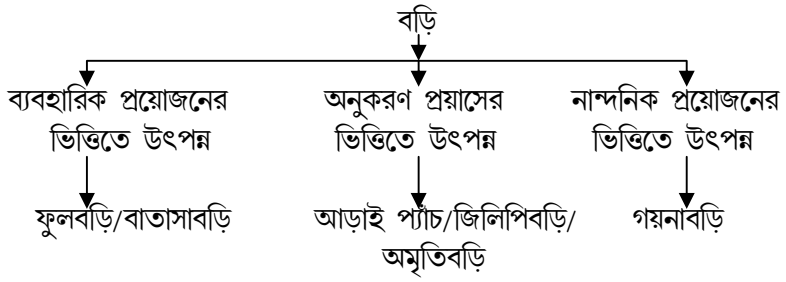

বাঙালি মেয়েদের ছোট থেকেই শেখানো হয় তার জগৎ তার স্বামী-পুত্র এবং তাদের আত্মীয় স্বজন। মেয়েদের পুরো জীবনটাই তাদের ঘিরে কিভাবে স্বামীর মন, শাশুড়ীর মন, আত্মীয় স্বজনের মন পাওয়া যাবে তারই অলিখিত প্রথাগত শিক্ষা চলতে থাকে। তাই নিজের থেকেও তার স্বামীর প্রতিবেশকে ভালবাসতে শেখে বাঙালি মেয়েরা। তখনকার দিনে চার দেওয়ালের বাইরে পা রাখা বারণ ছিল তাই তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটত চার দেওয়ালের মধ্যে ঘর গৃহস্থালীর ব্যবহার্য নিত্যদিনের ব্যবহারিক বস্তুর মধ্যে দিয়ে। কার বাড়ির গৃহিণীর হাতের আলপনা কত ভাল, সে কত ভাল পান সাজতে পারে, সেলাই করতে পারে - নিত্য নতুন আহার্য্য প্রস্তুত করতে পারে - এই ছিল প্রতিভার বিচারের মাপকাঠি। আত্মীয়স্বজনের মন পাওয়া মানেই স্বামী সোহাগি হওয়া। তাই নতুন নতুন জিনিস বানিয়া তাদের মন যোগানো। নিজের মনের স্বাভাবিক ভাল লাগাও সেই বস্তুর মধ্যে দিয়েই রূপ পায়। গয়নাবড়ির উদ্ভবের প্রেক্ষিত এতটাই।

বেশ কয়েক বছর আগেও বাপের বাড়ি ছেড়ে যখন ছোট্ট গাঁয়ের বধূটি হয়ে কোন মেয়ে পতিগৃহে আসে, তখন যে মানুষটি তার সব থেকে কাছের সেই সব থেকে দুরের মানুষ হয়ে থাকত। গুরুজন, স্নেহভাজন সবার মাঝখানে স্বামীর সাথে কথা বলা ছিল বারণ। শুধুমাত্র রাতের বেলাটুকুই তার জন্য বরাদ্দ। কিন্তু তবুও মনের কথা, প্রাণের কথা বলার মত অবকাশ কোথায়?....অবগুন্ঠিত বধুর লজ্জার ভারে কথা আর আসত না। দুকলম লিখেও যে মনের কথা জানাবে তারও কোন বালাই ছিল না। তাই রুমালের সুচী শিল্পে, বালিশের ওয়াড়ে, কাঁথায়, আর বড়ি দেবার অবসরে বড়ির মাধ্যমে স্বামীর কাছে পৌঁছে যেত বার্তা। ডালবাটার সাহায্যে বধূটি ফুটিয়ে তুলত তার মনের মত সীতাহার, অমলেট, কানের পাশা, পানহার, বাউটি, মাথার সিঁথি। এবং খাবার সময় সেই গয়নাবড়ির একটি ভেজে দেওয়া হত স্বামীর পাতে। স্বামীও ছিলেন রসিক নাগর। গয়নাবড়ির সীতাহার বা কানবালা দেখেই বধূর মনের কথা বুঝতেন এবং পরদিনই সেকরা ডেকে সেই জিনিস গড়ার অর্ডার দিতেন।[১৪]

বধূও খুশি হয়ে পরের বারের গয়নাটি বড়ি দিয়ে বানিয়ে তুলে রেখে দিত স্বযত্নে। সময়মত স্বামীর পাতে পরিবেশিত হত গয়নাটি। এইভাবেই বধুর মুখের ভাষা হয়ে ওঠে গয়নাবড়ি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিশিষ্ট লোকশিল্প সম্পদের রূপ নিয়েছিল। সাধারণত সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারাই যে এর জন্মদাত্রী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কালের বিবর্তনে সমস্ত স্তরের মহিলা মহলে এর প্রচারলাভ ঘটে।

সুদুর অতীতে এই ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিমন্ডলে গয়নাবড়ির বৈচিত্রপূর্ণ সম্ভারের সৃষ্টি হয়েছিল। গয়নাবড়ি শিল্প যুগের পর যুগ ধরে লোকসামাজিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন প্রকার মাঙ্গলিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে আত্তিকরণ করে এবং একে অপরের প্রয়োজনে, সহজ সরল সাবলীল ছন্দে শাস্ত্রকার রচিত শিল্পের ব্যকরণের নির্দেশের অপেক্ষা না করেই এগিয়ে চলেছে। পুরাতনের অঙ্গিকার ও নতুনের দাবী, ব্যবসায়িক চাহিদা সবই ফুটে উঠেছে। এরমধ্যে এই একান্ত নিভৃতে ঘরের কোনে মেয়েলি চাহিদার গর্ভে সৃষ্ট এই শিল্প। তাই আজ শুধু মেদিনীপুরের আঞ্চলিক সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে বহন করে না বরং সারা বাংলার খাদ্যশিল্প সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক।

৩.৩ গয়নাবড়ির অঞ্চল

পশ্চিম বাংলার ম্যাপ

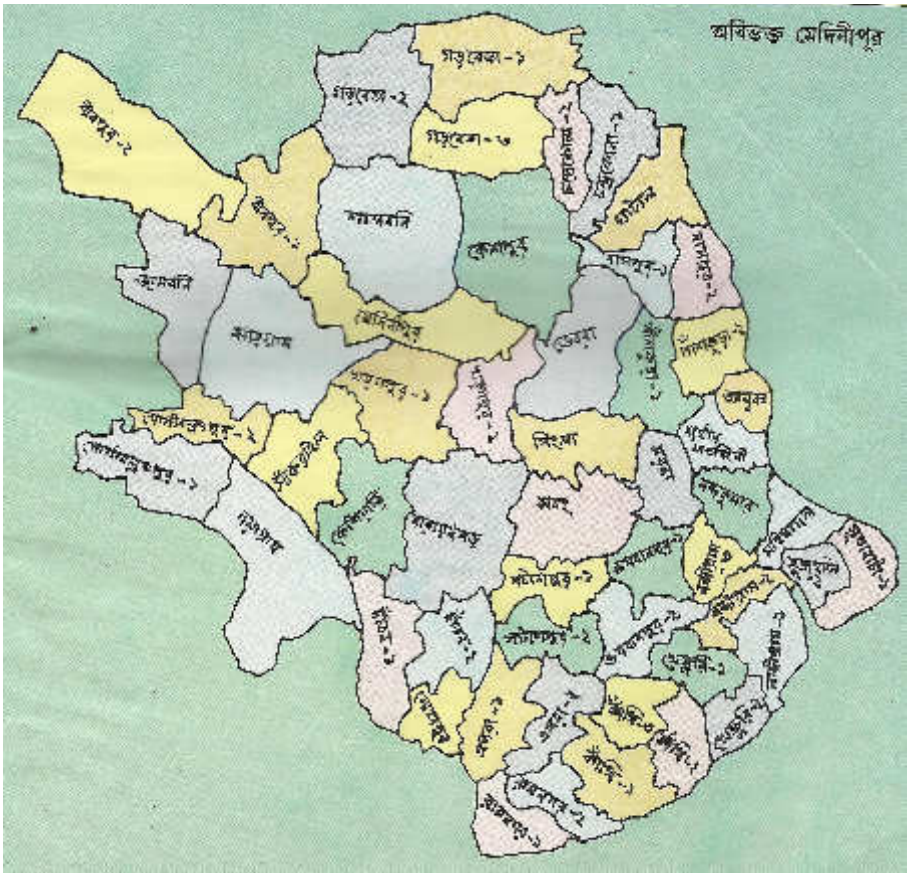

অবিভক্ত মেদিনীপুরের ম্যাপ

ক্ষেত্র সমীক্ষিত অঞ্চল

অবিভক্ত মেদিনীপুর

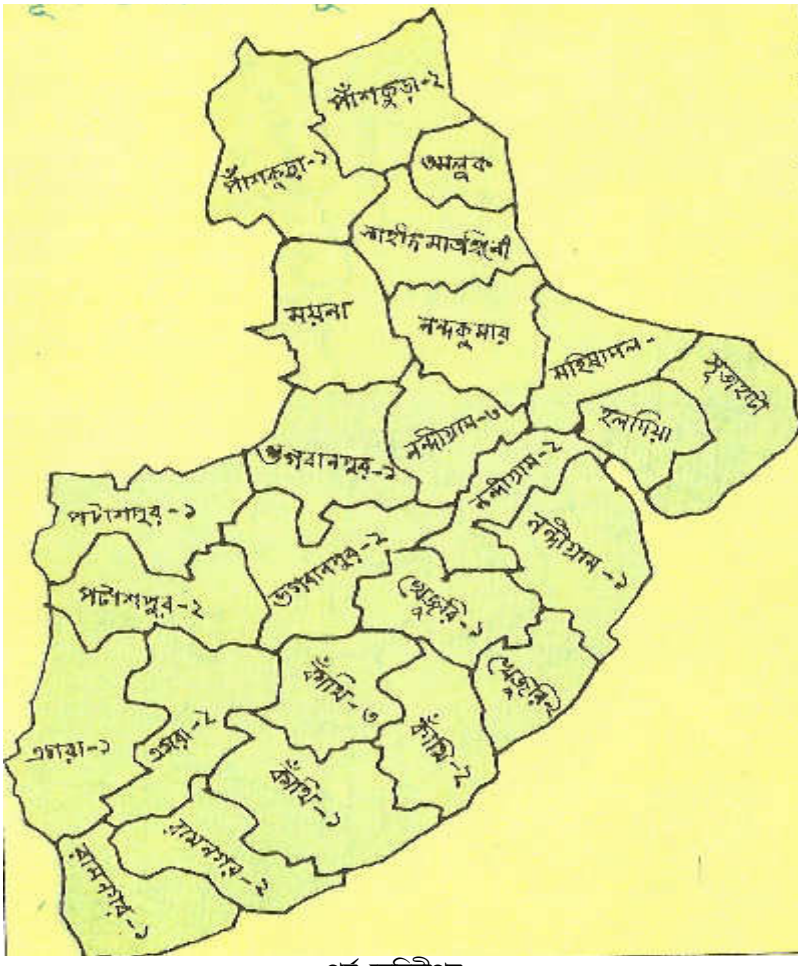

পূর্ব মেদিনীপুর

অবিভক্ত মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় গয়নাবড়ির বিস্তার

গয়নাবড়ি শিল্পটির উদ্ভব ও বিকাশ মেদিনীপুর জেলাতেই। অন্যান্য যে সমস্ত জেলায় গয়নাবড়ির অস্তিত্ব আছে তা হয় বৈবাহিক সূত্রে নতুবা জেলার মানুষজনের অন্যত্র স্থানান্তরের কারণে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই গয়নাবড়ির অঞ্চল আলোচনায় মেদিনীপুরেরই আলোচনা বেশি আসবে। বর্তমান গবেষিকা মেদিনীপুরের প্রায় সমস্ত ৮টি মহকুমাগুলির ৫৪টি ব্লকের মধ্যে ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর পার্শ্ববর্তী জেলায় ক্ষেত্রসমীক্ষা চালনা করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অবস্থান। অবিভক্ত মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গের অংশে বৃহত্তম জেলা। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার আয়তন ১৩৬১৯.১৫ বর্গ কিলোমিটার। ২১ ৩৬ থেকে ৩৫ ৩৭ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮ ৩৩ থেকে ৮৮ ১১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে এই জেলার অবস্থান।জেলার পূর্বদিকে রয়েছে দক্ষিণ২৪পরগণা ও হাওড়া জেলা, ভাগীরথীর নিম্নাংশ বা হুগলি নদী এবং রূপনারায়নের পূর্ব বা উত্তর পূর্বের সীমান্ত রেখা, পশ্চিমে বিহার এবং ওড়িশা, উত্তরে বাঁকুরা, উত্তর-পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। [১৪]

সমগ্রজেলার ভূমির গঠন ও ভূপ্রকৃতি বৈচিত্রপূর্ণ। জেলার পূর্বাংশ (বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুর) রূপনারায়ন, হলদি এবং হুগলি নদীবাহিত পলিবিধৌত অঞ্চল। পশ্চিম ও উত্তর পাথুরে অঞ্চল। এই অঞ্চলে টিলা (Archan Rock), ছোট পাহাড় দেখা যায়। দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। ফলে আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতিতে সমস্ত ধরণের বৈচিত্রই লক্ষণীয়। কোথাও তীব্র গরম, কোথাও মৃদু শীতলতা, কোথাও সামুদ্রিক মনোরম আবহাওয়া। মাটির ক্ষেত্রেও কোথাও পাথুরে মাটি, কোথাও বেলেমাটি, কোথাও এঁটেল মাটি আবার কোথাও লবণাক্ত বেলেমাটি, কোথাও পলিমাটি। এই ধরণের আবহাওয়া ও ভূপ্রকৃতির জন্য জেলার পূর্বাংশে ধান, গম, ডাল, বিভিন্ন ধরণের রবিশষ্য, শাকসব্জি, নারকেল, পান, সরষে প্রভৃতি ফলনের প্রাচুর্য রয়েছে। তেমনিভাবে বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী এলাকায় বাদাম, খেজুর, নারকেল, তালের উৎপাদন চোখে পড়ার মত।

মেদিনীপুর জেলা বহু ইতিহাসের সাক্ষী, প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব থেকে শুরু করে মধ্য ও আধুনিক যুগের অনেক ইতিহাস এই জেলার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। সংগৃহীত প্রত্নবস্তু ও তথ্যগুলির থেকে মেদিনীপুর জেলার সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি পরিষ্কার চিত্র বেরিয়ে আসে। অবিভক্ত মেদিনীপুর অতীত থেকে বর্তমান একটি চলন্ত গতিশীল জীবন।

জেলার নামকরণ কিভাবে মেদিনীপুর হল সে বিষয়ে বহুগুণীজনের বহুমত রয়েছে। ওড়িশার রাজা প্রাণকরের পুত্র মেদিনীকরের নামানুসারে মেদিনীপুর জেলার নামকরণ হয়। ‘মেদিনীকোষ’ নামক সংস্কৃত অভিধানের রচয়িতা এই মেদিনীকর। [১৫] মিদনাপুর নামটি ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত ‘আইন-ই-আকবরী’তে পাওয়া যায় এবং মেদিনীপুর নামটি গোপীজন বল্লভদাসের ‘রসিকমঙ্গল’ কাব্যে (১৬৫৯-১৬৬০) প্রথম পাওয়া যায়। [১৬]

মেদিনীপুর জেলার লোকসাধারণের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ। বিপুল জনগোষ্ঠী হওয়ার দরুণ এখানে মিশ্রসংস্কৃতির ধারা আবহমানকাল ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে। লোকসংস্কৃতির দিক থেকেও মেদিনীপুর অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানে- ভাদু, টুসু, ঝুমুর, কীর্তন, পটেরগান, ষষ্ঠীগান,

মনসামঙ্গলেরগান, কেষ্টযাত্রা প্রভৃতি লোকসঙ্গীত সমৃদ্ধ। তেমনিভাবে লোকনৃত্যে ছৌ, কানি, পাতা, পাইক, রনপা, ঝুমুর প্রভৃতির প্রচলন রয়েছে। এছাড়া ছড়া, ধাঁধাঁ প্রবাদতো রয়েছেই।

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, মেলা, পার্বন পালিত হয়। বাঁধনা পরব, সোহরায়, ভীমপূজা, পৌষপার্বন, টুসুপূজা, ভাদুপূজা ইত্যাদি।

বস্তুগতসংস্কৃতির দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় লোকশিল্পে মেদিনীপুর জেলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানকার লোকশিল্পগুলি মেদিনীপুর জেলার আঞ্চলিক পরিচিতি ও বিশ্বের দরবারে জেলার সামগ্রিক পরিচিতিকে বহন করে। মেদিনীপুরের লোকশিল্পগুলির মধ্যে রয়েছে -

১)মাদুরশিল্প, ২)পটশিল্প, ৩) কাঁসা-পিতল শিল্প, ৪) শঙ্খশিল্প, ৫) সিং-এর শিল্প, ৬) ডোকরা শিল্প, ৭)তাঁতশিল্প, ৮)বেতশিল্প, ৯)ধনুকশিল্প, ১০)মৃৎশিল্প, ১১)গামছাশিল্প, ১২)কাঁথাশিল্প, ১৩) গালার পুতুল শিল্প, ১৪) প্রস্তরশিল্প, ১৫)সোনা ও রূপার অলংকার শিল্প, ১৬)ফুলের গয়না শিল্প, ১৭)দড়িশিল্প, ১৮)বাঁশশিল্প, ১৯)শালপাতা শিল্প, ২০)গয়নাবড়ি শিল্প, ২১)ড্রাই ফ্লাওয়ার্স।

গয়নাবড়ির ইতিহাসের সুত্র কিন্তু মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে। সেইখান থেকে এর বিকাশলাভ হয়েছে।সম্পূর্ণ মেদিনীপুর জেলার ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং গ্রামের সংখ্যার সম্ভাব্য তালিকা দেওয়া হল- পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, পৃষ্ঠা: ২৭৭-২৭৯ [১৭]

সমগ্র মেদিনীপুর জেলার মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার যে সমস্ত যায়গায় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে গয়নাবড়ি পাওয়া গেছে সেইগুলি এখানে উল্লেখ করা হল -

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ৪টি মহকুমার মধ্যেই ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে। এই জেলায় ৪টি মহকুমা (Subdivisions) রয়েছে। সেগুলি হল -

১) তমলুক মহকুমা (Tamluk Subdivision),

২) হলদিয়া মহকুমা (Haldia Subdivision),

৩) এগরা মহকুমা (Egra Subdivision),

৪) কন্টাই মহকুমা (Contai Subdivision)।

তমলুক মহকুমার মধ্যে ক্ষেত্রসমীক্ষার অঞ্চল হল - তমলুক শহর, ময়না, পাঁশকুড়া, নন্দকুমার। তমলুক হল মেদিনীপুর জেলার সব থেকে প্রাচীন শহর। সভ্যতার প্রায় ঊষালগ্ন (নব্যপ্রস্তরযুগ) থেকে তমলুক ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্থান করে নিয়েছে। বহু প্রত্নতাত্ত্বিক

নিদর্শন এখানে রয়েছে। ঐতিহাসিক বন্দররূপে তমলুকের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। তাম্রলিপ্ত নামে এই বন্দরের পরিচয়। ফলে প্রাচীনকাল থেকেই তমলুক মহামিলন ক্ষেত্রর রূপ নেয়। বিশ্বের নানা প্রান্তের সাথে তমলুকের যোগাযোগ ছিল তাই মিশ্র সংস্কৃতির প্রতিফলন দেখা যায়। শিল্প সংস্কৃতির শিক্ষা বহুবিধ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থানরূপে গণ্য হয়।

গয়নাবড়ির জন্মভূমি বলা যেতে পারে এই তমলুককে। শহর থেকে শহরতলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীদের একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি। তমলুক শহরে সমস্ত বাড়িতেই গয়নাবড়ি দেবার প্রচলন রয়েছে। শীতকালে এই বড়ির আসর তমলুকের শীতকে আলাদা মাত্রা এনে দেয়। আগে অবসর বিনোদনের এই শিল্প বর্তমানে তমলুক শহরে মহিলাদের অর্থসংস্থানের হাতিয়ার। প্রত্যেকটি মুদি দোকানেই গয়নাবড়ি পাওয়া যায়।

ময়না ব্লক ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত। তমলুক থেকে ১০মাইল দূরে ময়নার অবস্থান। পাঁচটি নদীদ্বারা পরিবেষ্টিত ময়নার নামকরণের পিছনে পাঁচটি নদীর সাগরসঙ্গম 'মোহনা' অঞ্চল থেকে এসেছে। মোহনা-ময়না, আবার কারো কারো মতে ধর্মমঙ্গলে 'ময়না' 'সুখপাখি'র উল্লেখ রয়েছে তার থেকে এসেছে। কথিত আছে এখানে লাউসেনের রাজত্ব ছিল। পাল রাজারাও এখানে রাজত্ব করে গেছেন। 'ময়নাগড়' স্থাপন করে এখানে বহুদেবীর পূজা অর্চনা করেছেন। বর্তমানে ময়নাগড়ে বাহুবলীন্দ্র পরিবাবের বাস। কথিত আছে ময়না বাহুবলীন্দ্র পরিবারেই নাকি গয়নাবড়ি দেবার চল ছিল এবং বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ এই বড়ির সুনাম করেছেন। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে বাহুবলীন্দ্র পরিবারের সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায় পরবর্তী সেগুলি বলা যাবে। তবে 'ময়নাগড়ে' নয় ময়নায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে জানা গেছে এখানে প্রত্যেকটি বাড়িতেই গয়না বড়ি তৈরি হয়। এক্ষেত্রে কেউ কেউ 'ময়নাগড়ের' সাথে গয়না বড়ির ইতিহাসকে সমর্থন করে আবার কেউ করেন না। তবে বর্তমানে গয়নাবড়ি উৎপাদন এখানেও ব্যবসায়িক ভিত্তি লাভ করেছে। এখানকার মহিলারা স্বনির্ভর দল গঠন করে এর বাণিজ্যকরণ করছে।

পাঁশকুড়ার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে জানা গেছে পাঁশকুড়ার প্রত্যেকটি বাড়িতে গয়নাবড়ির প্রচলন নেই। তমলুক বা মেছেদার সাথে যাদের যোগাযোগ সেই সমস্ত বাড়িতেই গয়নাবড়ির দেওয়া হয়।

নন্দকুমার অঞ্চলটি তমলুক, বাজকুল ময়নার মধ্যবর্তী অঞ্চল নন্দকুমার এলাকায় গয়না বড়ির প্রচলন প্রচুর রয়েছে। শুধুমাত্র পারিবারিকভাবেই নয় এখানে গ্রামীণ মহিলারা স্বরোজগার যোজনার মাধ্যমে বড়ির একটি নিজস্ব বাজার তৈরি করেছেন। কেউ আবার সরকারি যোজনার বাইরে কাজ করে জীবিকা অর্জন করছেন।

হলদিয়া মহকুমায় ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা গেছে মহিষদল, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা অঞ্চলে গয়নাবড়ির প্রচলন বিশেষভাবে দেখা যায়। প্রত্যেক বাড়ির মেয়ে বউরা গয়নাবড়ি তৈরি করে থাকেন। মহিষাদলের বড়ির স্বাদের দিক থেকে বিশেষ নাম রয়েছে। এখানেও বড়ি তৈরি করে মেয়েরা অর্থসংস্থান এর পথ খুঁজে পেয়েছে। সুতাহাটা, নন্দীগ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে এখানেও গয়নাবড়ির বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে।

এগরা মহকুমার ভগবানপুর, পটাশপুর এবং এগরা শহরে ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ করা হয়। একথা বলা যায় যে তমলুক, হলদিয়া তুলনায় এখানকার প্রচলন খানিকটা হলেও কম। সমস্ত বাড়িতে প্রথানুযায়ী গয়নাবড়ি দেওয়া হয় না। তবে বেশ কিছু বাড়িতে এর প্রচলন রয়েছে। এখানের গয়না বড়ির ব্যবসায়িক দিকটিও তেমন চোখে পড়ার মত নয়।

কলাই মহকুমায় কাঁথি I , কাঁথি II এবং কাঁথি III তে ক্ষেত্রসমীক্ষা চালানো হয়। কাঁথিতে গয়নাবড়ির একটি নিজস্ব ঘরানা রয়েছে। বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা এর সঙ্গে যুক্ত। এবং গয়নাবড়ি কেন্দ্রিক বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান এখানে পালিত হয়। এখানকার পৌরসভায় বিভিন্ন সময়ে ট্রেনিংও করানো হয়। এবং বহু বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের প্রশংসায় এখানকার বড়ি শিল্প। স্বরোজগার দলের মাধ্যমে ব্যবসায়িক ভিত্তি তমলুক হলদিয়ার মত নয়। তবুও রয়েছে কিছু কিছু পরিবারের মেয়েরা নিজেরাই এর ব্যবসা খুঁলেছেন।

একথা এখানে বলা যায় যে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের দিকে যতই এগিয়ে যাওয়া যায় ততো গয়নাবড়ির প্রলেপ কিন্তু ক্ষীন হতে দেখা যায়। এখানে প্রচলন রয়েছে কিন্তু খুবই সামান্য উল্লেখযোগ্য নয়। গোনাগুনতি কয়েকটি পরিবার ভাল বড়ি দেয়। অবশ্যই পারিবারিক প্রয়োজনে কিছু ব্যবসায়িক দিকটি একেবারেই নেই বললেই চলে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের ৪টি মহকুমা রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি মহকুমায় ক্ষেত্রসমীক্ষা চালানো হয়েছে। যে চারটি মহকুমা (subdivision) রয়েছে সেগুলি হল -

১) খড়গপুর মহকুমা (Kharagpur Susdivision),

২) মেদিনীপুর মহকুমা (Midnapur Subdivision),

৩) ঘাটাল মহকুমা (Ghatal Subdivision),

৪) ঝাড়গ্রাম মহকুমা (Jhargram Subdivision)।

খড়গপুর মহকুমার মধ্যে যে সমস্ত যায়গায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে সেগুলি হল দাতন, খড়গপুর, নারায়ণগড়। এই সমস্ত অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষার পর জানা যায় নারায়নগড়, বেলদা, অমরশী,

খাকুড়দা, প্রভৃতি অঞ্চলে বেশকিছু বাড়িতে গয়নাবড়ি তৈরি হয়। এর মধ্যে অমরশী এলাকার বড়ির একটা নিজস্ব ঘরানা রয়েছে। দাঁতন ও খড়গপুরে যে সমস্ত শিল্পিরা রয়েছে তারা কোন না কোন ভাবে তমলুক ময়না, অর্থাৎ পূর্ব মেদিনীপুরের এলাকার সঙ্গে যুক্ত।

মেদিনীপুর মহকুমায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয় মেদিনীপুর টাউন ও গড়বেতায়। এই মেদিনীপুর শহরে জেলার বিভিন্ন দিক থেকে লোকজন এসে বসবাস করছে ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে বহন করে নিয়ে চলে এই শহর। স্কুল বাজার কেরানী, ওলা, গোলকুয়াচক, প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু পরিবার যেখানে গয়নাবড়ির প্রচলন রয়েছে। গড়বেতা অঞ্চলে গয়না বড়ির বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। আতিথেয়তায় গয়নাবড়ির জুড়ি মেলা ভার। সেটি আর একবার মনে পড়ে যায় এই অঞ্চলে এলে ব্যবসায়িকভাবে গয়নাবড়ির বিশেষ প্রচলন এখানে নেই। তবে কিছু কিছু দোকানে গয়না বড়ি কিনতে পাওয়া যায়। স্থানীয় কিছু শিল্পি এগুলি সাপ্লাই করে।

ঘাটাল মহকুমায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয় ঘাটাল ও দাসপুরে। এই অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে গয়নাবড়ির উৎপাদন চোখে পড়ে। কিছু কিছু পরিবার বিশেসভাবে পারদর্শি। দাসপুর এলাকাও তাই। ব্যবসায়িকভাবে এর প্রচলন এখানে খুব কম। শহরে কিছু কিছু দোকানে স্থানীয় শিল্পির বানানো বড়ি পাওয়া যায়।

পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ক্ষেত্রসমীক্ষার পর গয়নাবড়ি নির্দিষ্ট অঞ্চল বলতে পূর্ব মেদিনীপুরকেই বলা যায়। কারণ পূর্ব মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এর উদ্ভব। জেলার প্রত্যেকটি বাড়িতেই গয়নাবড়ির উৎপাদন হয়। সম্ভ্রান্ত বাড়ির শীতকালীন আচারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই বড়ি। নভেম্বর মাসের শুরু থেকেই পূর্ব মেদিনীপুরে যদি যাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে শীতের মিঠে রোদে পিঠ দিয়ে মা কাকিমাদের বড়ি দেবার আসর। তার সাথেই চলে জমজমাট আড্ডাও। সহকারিনী ছাড়া কিন্তু গয়নাবড়ি দেওয়া যায় না। তাই খোশ মেজাজে মেয়েলি আড্ডার মধ্যে দিয়েই তৈরি হতে থাকে গয়নাবড়ি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্যান্য জেলায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন, সাগরদ্বীপ, কাকদ্বীপ, নামখানা নদীয়ার কৃষ্ণনগর, নৈহাটি, কলকাতার বাগবাজার, হাওড়া, হুগলী জেলায় গয়নাবড়ি তৈরি হয়। কিন্তু মজার বিষয় যে সমস্ত শিল্পিরা এই গয়না বড়ি তৈরি করেন তারা কোন না কোনভাবে মেদিনীপুরের সাথে যুক্ত। বৈবাহিক সূত্রে কেউ কলকাতায় বা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গেছেন। আবার কেউ চাকুরীসূত্রে অন্য জায়গায় পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু তাদের একান্ত আপন শিল্পটিকে নিজের মধ্যে করেই নিয়ে গেছে। যেখানে বসবাস করছে সেইখানেই তাদের শিল্পের পসরা নিয়ে বসেছে। মেদিনীপুর থেকে অন্য রাজ্যে শিল্পের প্রসার

এইভাবেই হতে দেখা গেছে। স্থানীয়ভাবে মেদিনীপুর ছাড়া অন্য কোন জেলায় এর উদ্ভব ও প্রসার নেই।

৩.৪ গয়নাবড়ির পারিবারিক ঐতিহ্য ও শিল্পী পরিচয়

গয়নাবড়িকে ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন পরিবারের আচার-আচরণ রীতি রেওয়াজ ইত্যাদি। বছরের পর বছর ধরে ঠাকুমা থেকে মা, মা থেকে মেয়ে-বউ বংশপরম্পরায় পরিবাহিত হয়ে থাকে গয়নাবড়ি। কবে কে এর আবিষ্কার করেছে কেউ বলতে পারে না। কিন্তু শিল্পিদের মুখে শোনা যায় - ''আমার ঠাকুমা দিতেন মা দিতেন সেখান থেকেই শিখেছি''। আবার কেউ বলেন ''আমাদের বংশে বড়ির রেওয়াজ আছে - একটু হলেও বড়ি দিতেই হবে।'' প্রত্যেকের বক্তব্যেই বংশের ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যে গয়নাবড়ি জড়িয়ে আছে সে কথা স্পষ্ট।

কোন কোন পরিবারের মেয়ের বিয়ের ফুলসজ্জার তত্ত্বে ফুল মিষ্টি বস্ত্রের সাথে অবশ্যই গয়নাবড়ি পাঠাতে হয়। এই রেওয়াজ আবার কোন পরিবারে বধূবরণে শাশুড়ি রূপার চোঙ দিয়ে বধুর মুখ দেখেন এবং বলেন ''তোমার হাতের বড়ি যেন পরিবারের সকলের মন জয় করে।'' এই রূপারচোঙ আবার শাশুড়ি তার শাশুড়ির কাছ থেকে পেয়েছিলেন। কোন কোন পরিবারে নতুন বিয়ে হয়ে আসা বধূটির দিদি শাশুড়ির বড়ি দেওয়ার চোঙের উপর নজর থাকত। শীতের সকালে নববধূ থেকে শুরু করে বাড়ির ছোট মেয়েটি বয়ঃজ্যেষ্ঠ শাশুড়িদের গয়নাবড়ি দেবার সহযোগী হিসাবে কাজ করতেন ধিরে ধিরে দেখতে দেখতে অলপ-স্বল্প দিতে দিতে নববধূ ও ছোট মেয়েটি ভাল করেই শিখে যেত গয়নাবড়ির কারুকার্য ও দেবার পদ্ধতি।

কমলকুমার কুন্ডু দেশ পত্রিকায় 'গয়নাবড়ি অঙ্গনে' নামক প্রবন্ধে বলেন -

> ''মোট তিনটি পরিবারের গয়নাবড়ি সুত্রপাত হয়ে বর্তমানে বিস্তৃতি। প্রথমটি লক্ষ্যাগ্রামের মাইতি পরিবার, দ্বিতীয়টি ময়নাগড়ের রাজবাড়ি এবং তৃতীয়টি তমলুকের রেনুকা মন্ডলের পরিবার।''

একথাটির সত্যত্য প্রমাণিত নয় - পুরো মেদিনীপুর জেলায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করে জানা গেছে এমন অনেক পরিবার আছে যারা গয়নাবড়ির ঐতিহ্যকে বংশ পরম্পরায় বহন করে আসছে। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই গয়নাবড়ির বিকাশ এবং সৌন্দর্যায়নের ক্ষেত্রে এই তিন পরিবারের ভূমিকা অশেষ।

মাইতি পরিবার

প্রথমেই আসি মহিষাদলের লক্ষ্যাগ্রামের মাইতি পরিবারের কথায়- এই পরিবারের বধূ হিরন্ময়ী দেবী তার পিত্রালয় কাঁথিতে। শাশুড়ি শরৎকুমারী দেবীর কাছ থেকে খুব ভাল করেই রপ্ত করেছিলেন বড়ি দেবার কৌশল। মাইতি পরিবার বরাবরই সংস্কৃতি মনস্ক। হিরন্ময়ীদেবীর পুত্র আশিস মাইতি এবং কন্যা সেবা মাইতি। দুই ভাইবোন শান্তিনিকেতনের কলাভবন সঙ্গীতভবনের ছাত্র ছিলেন। সঙ্গীত শিক্ষা নেবার জন্যই তাদের শান্তিনিকেতনে যাওয়া এরকম কথা জানা যায়।

গয়নাবড়ি পরিহিতা সেবা মাইতি

পরিবারে প্রথম থেকেই গয়নাবড়ি দেবার বিশেষ প্রচলন ছিল। শীতের মরসুমে প্রথাগতভাবেই আচার অনুষ্ঠান নিয়ম কানুনের মধ্যে দিয়ে বড়ি দেবার কাজ শুরু হত। ট্র্যাডিশনাল ডিজাইন (প্রথাগত নক্সা), গয়নার নক্সা, নেকলেশ, নথ, তোড়া, মুকুট ইত্যাদি হল এই পরিবারের পারস্পরিক নক্সা। পৌষ সংক্রান্তির দিন বহু ব্যঞ্জন সহযোগে লক্ষীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ব্যঞ্জনেই এর উদ্বোধন ঘটে। এছাড়া প্রজাপতি, ধূপবদানি, ইত্যাদিও নক্সার মধ্যে ধরা পড়ত।

গয়নাবড়ি দিচ্ছেন হিরন্ময়ী দেবী

সেবা মাইতির মা হিরন্ময়ী দেবী ও ঠাকুমা শরৎকুমারী দেবীর বড়ি রবীন্দ্রনাথকে উপহার হিসাবে দেন। রবীন্দ্রনাথ এই বড়ির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ এই বড়ির গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন এনাদের বড়িকে কলাভবনে রক্ষা করার সংকল্প করেছিলেন এবং নন্দলাল বসু এই সম্পর্কে একটি বই এর কথা প্রস্তাব করেছিলেন। ধীরে ধীরে এই পরিবারের মাধ্যমে রসনা থেকে শৈল্পিকবোধে উন্নীত হল গয়নাবড়ি। শান্তিনিকেতনে পড়ার সুবাদে বিবিন্ন নক্সা এঁকে দিতেন সেবা মাইতি ও আশিস মাইতি। ফলে গয়নাবড়ির নক্সার কারুকার্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যায়। ধীরে ধীরে এই পরিবারকে ঘিরেই গয়নাবড়ির একটি বিশেষ ঘরানা তৈরি হল। এখানে বড়ি খাদ্যবস্তু তো বটেই কিন্তু শৈল্পিক দিকও নজর কাড়ার মত। রূপের বাহারে ছন্দে গুণে দর্শকের দৃষ্টি আপ্লুত করে তুলত এই গয়নাবড়ি।

বাহুবলীন্দ্র পরিবার

গয়নাবড়ির সাথে বাহুবলীন্দ্র পরিবারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কথিত আছে এই পরিবারের মাধ্যমেই গয়নাবড়ির উৎপত্তি। ক্ষেত্রসমীক্ষায় এমনকোন তথ্য উঠে আসেনি। বর্তমান ময়নাগড়ের রাজাদের উপাধি বাহুবলীন্দ্র। বাহুবলীন্দ্ররা উৎকলজাত। তাঁদের উপাধিটিও বঙ্গীয় আভিজাত পরিবারের উপাধি নয়। অতএব এই পরিবারে উৎকলীয় প্রভাব থাকা সম্ভব। [১৬]

বাহুবলীন্দ্রদের বসতবাড়ি ময়নাগড়ের - ময়নাগড় নামের একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। গড়টির চারপাশ কালিদহ নামক পরিখাদ্বারা বেষ্টিত। পরিখাটি প্রায় ১৫০-১৭০ ফুট প্রস্থ এবং সেখান থেকে গড়ভূমি একটু উঁচু। এখানে বাহুবলীন্দ্রদের বাসস্থান - কুলদেবতা শ্রী শ্রী শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির লোকেশ্বর নামক শিবের মন্দির দপ্তরখানা ইত্যাদি অবস্থিত। এখনেও গড়ের মধ্যে প্রবেশ করতে গেলে নৌকার প্রয়োজন হয়। এবং এই নৌকার মাধ্যমেই গড় থেকে বেরোনো ও ঢোকা যায়। চাইলেই কেউ গড়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না কিংবা গড় থেকে বাইরে বেরোতে পারে না।

বর্তমান গবেষিকা ময়নাতে একজন ক্ষেত্রবন্ধুর মাধ্যমে ময়নাগড় প্রবেশ করতে পেরেছিল এবং সেখানে তাকেও নৌকার মাধ্যমেই গড়ে প্রবেশ করতে হয়েছিল। সেখানে গিয়ে ছোট পুত্রবধূর সাথে কথা হয় এবং তিনি সেদিন বর্তমান গবেষিকাকে তার হাতের তৈরি বড়িও দেন।[১]

কিন্তু এখন তেমনভাবে আর বড়ি কেউ তৈরি করেন না। কিন্তু তিনি তার দিদি শাশুড়ির কাছ থেকে বড়ির চোঙটি রেখে দিয়েছিলেন।

ময়নাগড়ের রাজবাড়ির বর্তমান বংশধর প্রবন বাহুবলীন্দ্রর মা বিন্দবাসিনী দেবী ছিলেন অত্যন্ত অতিথিবৎসল মানুষ। রাজবাড়ির আভিজাত্যটুকু বজায় রাখার অকুল প্রয়াস ছিল তার মধ্যে। তিনি অত্যন্ত সুন্দর গয়নাবড়ি দিতেন এবং তার বড়ির সুখ্যাতি বহুজনবিদিত। আজ থেকে ৫০ বছর আগের কথাতো বটেই তখন ময়নাগড়ে বড়ি দেবার প্রচলন এবং রীতিতে ছিল আভিজাত্যের ধারা। শীত এলেই পরিবারের সকলে মিলে মিশে বড়ি দেবার প্রথা বহুদিনের। শুধুমাত্র নিজেদের খাওয়ার জন্যই নয় - এই রাজবাড়ি থেকে বহু গয়নাবড়ি উপঢৌকন বা উপহার হিসাবে দেশ-বিদেশে বা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে গেছে। প্রনব বাহুবলীন্দ্র তখন কলকাতা ইউনিভারসিটির ছাত্র। তিনি তার পরিবারের এই অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পকে লোকসম্মুখে আনার জন্য দেশ পত্রিকায় এই শিল্প নিয়ে একটি লেখা লেখেন - সেই লেখা বহু প্রশংসিত হয়। বিন্দ্যবাসিনী দেবী তার মা সতীরাণী ও কন্যা মিনতিকে এই শিল্পে পারদর্শী করে তোলেন। শুধু পরিবারের লোকজনই নয় শীতকালে পাড়া প্রতিবেশী এমনকি আসে পাশের অঞ্চল থেকে বউ মেয়েরা

সহকারী হিসাবে কাজ করতে আসত এবং ধীরে ধীরে গয়নাবড়ি দেবার 'ভাঁজকে' করায়ত্ত করাই ছিল লক্ষ্য।

বিন্দ্যবাসিনী দেবীর আতিথেয়তার কথা পরবর্তী অধ্যায় আলোচনা করা যাবে। বর্তমানে সেই চল আর নেই - ২০১০ সালে গিয়েও বর্তমান গবেষিকা গয়নাবড়ি দেবার চল দেখে এসেছে। কিন্তু এই ২০১২ সালে ২১শে ডিসেম্বর প্রণব বাহুবলীন্দ্রর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ হবার পর তিনি জানান এখন আর গয়নাবড়ি দেবার চল নেই। তবে ইতিহাস কখন থেমে থাকে না, সে তার পরিধি ব্যপ্ত করবেই - হয়ত ঠিক এর পুনরাবৃত্তি হবেই এই আশা রাখা যায়।

সামন্ত পরিবার :

বড়িশার তপোবনে গয়নাবড়ির মন্ডপ সজ্জায় রত সামন্ত পরিবার

পূর্ব মেদিনিপুরের বাজকুলের কাখুরিয়া গ্রামের সামন্ত পরিবার। প্রায় ৮০ বছরের বেশি এই পরিবারের গয়নাবড়ির চর্চা। পরিবারের কত্রা শ্রী ভূপতি ভূষণ সামন্ত এবং ভাই নৃপতি ভূষণ সামন্ত। ভূপতি ভূষণ সামন্তের স্ত্রী স্নেহলতা সামন্ত বড়ি দেওয়ার কাজে পটু ছিলেন। স্বাদের দিক থেকে তার বড়ি ছিল অতুলনীয়। আড়াইপ্যাঁচ ও জিলিপিবড়ি দেবার চল ছিল বেশি। গয়নাবড়িও দেওয়া হত প্যাঁচের ডিজাইনে। তবে ভূপতি সামন্তের পুত্র অজয় কুমার সামন্তের স্ত্রী পাবর্তী সামন্তের হাত ধরেই পরিবারের গয়নাবড়ির ডিজাইনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। পাবর্তী সামন্ত বর্তমানে বিখ্যাত গয়না বড়ি শিল্পিদের মধ্যে একজন। তিনি শুধু নিজে নন পরিবারের দেওর তরুণ সামন্ত, অতনু সামন্ত অন্যান্য সদস্যা শিখা সামন্ত, শ্যামলী নায়েক (সামন্ত) সবাইকেই পারিবারিক এই শিল্পকর্মটিকে বাঁচিয়ে রাখার তালিম দিয়েছেন।

এই পরিবারের হাত ধরেই শিল্পটি কলকাতার পূজামন্ডপে উঠে এসেছে। এই পরিবারের সদস্যরা টানা তিনমাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে গয়নাবড়ির একটি সম্পূর্ণ মন্ডপ তৈরি করে। সেখানে মাতৃমূর্তির পোশাক-অস্ত্র ও গয়না সবই ছিল গয়নাবড়ির তৈরি। এই শিল্পী দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শিল্পী পার্বতী সামন্ত।

যেখানে বলার বিষয় গয়নাবড়ির সাবেকিআনা বিলুপ্তির পথে কিন্তু এখনও এই বাড়িতে গেলে দেখা যায় পারিবারিক প্রথা মেনেই গয়নাবড়ি দেবার একটা চল রয়েছে। আশেপাশের প্রতিবেশী বা অন্য গ্রাম থেকেও লোকজন আসে মেয়ের বিয়ের তত্ত্বের বড়ি তৈরির জন্য কিংবা স্কুলে কর্মশিক্ষায় গয়নাবড়ি তৈরির জন্য। পয়সার বিনিময়ে গয়নাবড়ি তৈরি করেন না এই পরিবার। মনের আনন্দ আর হৃদয়ের আবেগই বড়কথা।

শিল্পী পার্বতী সামন্তর কন্যা বিবাহের কার্ড

এখনো এই পরিবারের আত্মীয় স্বজনরা শীত এলেই অপেক্ষা করে থাকে বড়ির উপহারের জন্য। শিল্পি পাবর্তী সামন্ত তার পরিবারের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছেন। নতুন নতুন ডিজাইনের বড়ি তৈরিতে উৎসাহ জুগিয়েছে স্বামী, পুত্র, কন্যা। এই পরিবারের বড়ির খুবই সুখ্যাতি এবং এই শিল্পের প্রতি তাদের অগাধ ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায় তার কন্যার বিয়ের কার্ড দেখে। এখানে বিয়ের কার্ডের মধ্যে গয়নাবড়ির ছবি কার্ডটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। বিয়ের তত্ত্বে যে বড়ি দেওয়া হয় তাও ছিল নজরকাড়ার মত। ক্ষেত্রসমীক্ষায় গিয়ে আশেপাশের গ্রামেও যে এই পরিবারের বড়ির সুখ্যাতি রয়েছে তা জানা যায়। এই গয়নাবড়ির সূত্রেই বহু গুনী মানুষের সঙ্গে এই পরিবার যুক্ত।

তবে বড়ি নিয়ে কোন বিশেষ আচার অনুষ্ঠান এরা পালন করে না। এখানে গয়নাবড়ি মানেই শুধুই মনের আনন্দ, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও রসনা বিলাস। প্রথাগত ডিজাইনের মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়াতো রয়েছেই কিন্তু ঐতিহ্য থেকে কখনোই বেরিয়ে আসে নি। গয়নাবড়িতে রঙের ব্যবহার এখানে নেই অথচ মশলা দিয়ে মিনেকারির কাজ অসাধারণ। গোটা মশলার প্রাকৃতিক রঙেই রঙিন হয়ে ওঠে গয়নাবড়ি।

খাটুয়া পরিবার :

পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদার খাটুয়া পরিবারও বড়ি শিল্পে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। পরিবারের কত্রী বাসন্তী খাটুয়া শিক্ষক মধুসূদন খাটুয়ার স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দর গয়নাবড়ি দেন। তাঁর পুত্রবধু পূর্ববঙ্গের হলেও বিয়ের পর শাশুড়ি, কাকিশাশুড়ির কাছ থেকে বড়ি দেওয়া শেখে। বর্তমানে

একজন সুদক্ষ শিল্পি। পূর্ববঙ্গের আচার-আচরণ, সামাজিক রীতিনীতি একেবারেই আলাদা। অথচ পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারায় একজন মেয়ে পুত্রবধু হিসাবে গয়নাবড়ি বানানোর রীতিনীতি খুবই তাড়াতাড়ি আয়ত্ব করে ফেলে। প্রথমে শুধু সহকারি হিসাবে কাজ শুরু করে। ধীরে ধীরে একটি প্যাঁচ, আড়াই প্যাঁচ, তারপর ধীরে ধীরে গয়নাবড়ির নক্সা।

এই পরিবারে পৌঢ়া অষ্টমির দিন বড়ি দেবার পালা শুরু হয়, চলে দোল পূর্নিমা অবধি - কত্রী বাসন্তী খাটুয়ার কথায় -

> ''আমাদের পরিবারে পৌঢ়াঅষ্টমির দিন বড়িহাত করার পরই বড়ি দিতে হয়। কিন্তু চালকুমড়ার বড়ি দেওয়া আমাদের পরিবারে নেই।''

বড়মেয়ে মিনু বিবাহসূত্রে তমলুকের বাসিন্দা এবং তার বড়ি দেবার কাজ আরো সমৃদ্ধি ঘটেছে। এঅখনে চালকুমড়োর বড়ি দেবার চল রয়েছে।

এইপরিবার ব্যবসায়িকভাবে বড়ির ব্যবহার করে নি। এখনো শীতের আমেজ একটু বেশি হলেই দিনক্ষণ দেখে বড়ি দেবার কাজে লেগে পরেন। পরিবারে নাতনি সংঘমিত্রার বিয়ে হয় তমলুক আবাস বাড়ির দাস বাড়িতে। তমলুকে দাসদের বাড়ির গয়নাবড়ির বিশেষ নাম রয়েছে। ব্যবসায়িকভাবে এই পরিবার বিশেষ প্রতিষ্ঠিত।

দাস পরিবার :

দাস পরিবারের কর্ম সংস্থানের হাতিয়ার হল এই গয়নবড়ি। আগে তাঁতের কাজ করে চলত সংসার কিন্তু তাতে ভাল করে দিনযাপন হত না। তাই ভগবতী দেবী শীতের মরশুমে বড়ি দিয়েই রোজগার করেন। শুধুমাত্র গয়নাবড়ি নয় বিভিন্ন ধরণের বড়ি রয়েছে এর মধ্যে। পূজার পর থেকেই একটু শীতের আমেজ পরার সাথে সাথেই কাজ শুরু করে দেয় পরিবারের সকলে।

দাস বড়ি শিল্পালয়

যেহেতু পরিবারে বড়ির ব্যবসায়িক দিকটি রয়েছে তাই বাটার জন্য গ্রাইনডার (বিশেষ ডালবাটার মেশিন) ব্যবহার করে। ভগবতী দেবী, স্বামী কৃষ্ণগোপাল ও কন্যা পারমিতা সবাই এই কাজে বিশেষভাবে সাহায্যা করে। পারমিতা যথেষ্ট শিক্ষিতা, ইতিহাসে এম. এ. করেছে। পড়াশুনার প্রায় বেশির ভাগটাই এই বড়ির ব্যবসার মাধ্যমে এসেছে। তমলুকের দুর্গামন্দির অঞ্চলের সবাই একডাকে এই পরিবারকে চেনে। বহু জায়গায় বড়ি সাপ্লাই করে ভগবতী দেবী ও তার পরিবার। লোকাল মারকেট তো অবশ্যই তার সাথে তমলুকের আশেপাশের মারকেটেও বড়ির সাপ্লাই দেয়।

যেহেতু পরিবারে বড়ির ব্যবসায়িক দিকটি রয়েছে তাই বাটার জন্য গ্রাইনডার (বিশেষ ডালবাটার মেশিন) ব্যবহার করে। ভগবতী দেবী, স্বামী কৃষ্ণগোপাল ও কন্যা পারমিতা সবাই এই কাজে বিশেষভাবে সাহায্যা করে। পারমিতা যথেষ্ট শিক্ষিতা, ইতিহাসে এম. এ. করেছে। পড়াশুনার প্রায় বেশির ভাগটাই এই বড়ির ব্যবসার মাধ্যমে এসেছে। তমলুকের দুর্গামন্দির অঞ্চলের সবাই একডাকে এই পরিবারকে চেনে। বহু জায়গায় বড়ি সাপ্লাই করে ভগবতী দেবী ও তার পরিবার। স্থানীয় বাজার তো অবশ্যই তার সাথে তমলুকের আশেপাশের বাজারেও বড়ির সাপ্লাই দেয়।

অবসর বিনোদনের শিল্প কখন পরিবারের অন্নসংস্থানের রাস্তা করে দেয় তার পরিচয় মেলে এই পরিবারকে দেখলে। শীতের সময় বড়ির মেলা বসে 'দাসবড়ি শিল্পালয়' - যে কারখানাটি চলে তা 'গয়নাবড়ি' সম্পর্কে ধারনাটাই বদলে দেয়।

বিভিন্ন পরিবারের ক্ষেত্রে গয়নাবড়ির উপযগিতা, প্রয়োজনীয়তা ভিভিন্ন রকম। কোথাও আচার-আচরণে কোথাও মনের আনন্দে কোথাও অতিথেয়তায়, কোথাও মর্যাদায়, আবার কোথাও অন্নসংস্থানে। প্রতিটি দিকই চোখে পড়ার মত। কিন্তু সবের মধ্যেও শিল্পির হৃদয়ের যে অনুভূতি সেটাই বড় কথা। আর এই অনুভূতিটুকু কিন্তু সমস্ত পরিবারের ক্ষেত্রেই এক।

গয়নাবড়ি যেহেতু মেয়েলি শিল্প এবং গার্হস্থ শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম সেহেতু পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রত্যেক ঘরেই এই শিল্পের শিল্পী রয়েছে। কারো হাতের কাজ খুব ভাল, কারো শুধু ভাল, আবার কারো সাধারণ। তবে শিল্পী কিন্তু প্রত্যেকেই। কিছু বিখ্যাত শিল্পীরা রয়েছেন যাদের হাতের বড়ি সত্যই সুন্দর ও শিল্পসুষমাসম্পন্ন। এদের মধ্যেই কিছু শিল্পীর একান্ত সাক্ষাৎকার তুলে ধরা হল এবং ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত কিছু শিল্পীর নামের তালিকা দেওয়া হল।

শিল্পী পার্বতী সামন্ত ও গবেষিকা

শিল্পীর নাম : পাবর্তী সামন্ত
ঠিকানা : গ্রাম কাখুরিয়া বাড়ি
প্রো: কিসমত বাজকুল
পুলিশষ্টেশন: ভূপতিনগর
জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর
পিন:৭২১৬৫৫
স্বামীর নাম: অজয়কুমার সামন্ত
বয়স-৬০ বছর

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাজকুলের কাখুরিয়া গ্রামের গৃহবধূ পাবর্তী সামন্ত। দক্ষিণ চব্বিশপরগণার পাথর প্রতিমা এলাকার মেয়ে। ছোটবেলা থেকে আলপনা ও সুচীশিল্পে পারদর্শী। পাথর প্রতিমায় কিন্তু গয়নাবড়ির প্রচলন নেই। জন্মসূত্রে পাওয়া প্রতিভা কিন্তু নয়। বিবাহসূত্রে পাওয়া প্রতিভা। শিল্পীর ভাষায় -

''এই শিক্ষা আমার মায়ের থেকে পাওয়া নয়। শাশুড়ি, কাকীশাশুড়ির কাছ থেকে পাওয়া, বিয়ের পরই শেখা।''

কথায় কথায় শিল্পী জানায় - শাশুড়িমা শুধুমাত্র থাক বড়ি, আড়াই প্যাঁচের বড়ি এবং প্যাঁচের বড়ি দিতেন। আলপনার বানক্সার বাহার ছিল না। চোঙ এর ক্ষেত্রেও প্রাচীন এক ধারা দেখা যায় - আগে পেষ্টের ঢাকনা, বোরোলীনের ঢাকনা ব্যবহার করা হত চোঙ হিসাবে। ধীরে ধীরে লম্ফের ঢাকনা অর্থাৎ যেখান থেকে সলতে ঢোকানো হয় সেটি ব্যহার করা হতে থাকে। তারপর ধিরে ধিরে পেতল, রূপোর চোঙ বানানো হয়।

শিল্পির কথায় -

''আগে বোরোলীনের ঢাকনা দিয়ে বড়ি দিতাম। একবার বাজারে গিয়ে দেখি লম্ফের ঢাকনা বিক্রি হচ্ছে বড়ি দেবার জন্য। হাতে চাঁদ পেলাম। তারপর থেকেই বড়ির উপর নক্সার কারুকার্য করলাম।''

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগর থানার গড়বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাখুরিয়া বাড়ি গ্রামের অজয় সামন্তের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আজ তিনি এই গ্রামেরই বাসিন্দা। শ্বশুর মহাশয় ভূপতি ভূষন সামন্ত সরকারি কর্মচারী ছিলেন। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ পরিবারে বড়ি দেবার পরম্পরায় পার্বতী সামন্তর শিল্পী সত্তা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। শিল্পী আশেপাশের গ্রামে 'বড়িমাসি' বলে বিখ্যাত। শীতের মরসুমে অনাথ আশ্রমের বাচ্চা থেকে শুরু করে গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা 'বড়ি মাসির' বড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। সুদক্ষ হাতে ডিজাইন ও ভালোলাগার এত অপূর্ব মেলবন্ধন সত্যিই অকল্পনীয়।

ডবল ডিজাইন দেবার জন্য দক্ষ হাতের প্রয়োজন। সেই দক্ষ হাতেই শিল্পীর বড়ি দেওয়ার কাজ চলে সারা শীতকাল জুড়ে। বহুগুণী মানুষের প্রশংসা পান তিনি। কলকাতায় তার হাতের তৈরি বড়িই পূজা প্যান্ডেলের শিল্পের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটায়।

শিল্পীর ভাষায় -

''কোলকাতার প্যান্ডেলের কাজটি গয়নাবড়ি শিল্প হিসাবে আমার বিশেষ সাফল্য। পুরো তিনমাসের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই কাজ যখন শারদসম্মান পেল তখনই মনের একটা অদ্ভুত শান্তি পেলাম।''

শিল্পী কখনোই তার পরিবারকে বাদ দিয়ে একক প্রচেষ্টার কথা বলেন না - তার মুখে সবসময়ই শোনা যায় তার পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা -

'' আমাদের পরিবারের সকলের প্রচেষ্টা ভালোলাগা শ্রম না থাকলে এই কর্মকান্ড করা যেত না।''

শিল্পীর এই গয়নাবড়ির তৈরির পিছনে কোন ব্যবসায়িক ভিত্তি নেই। তিনি আজও মনের খেয়ালে পারিবারিক পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রেখে বড়ি তৈরি করে যাচ্ছেন। ব্যবসায়িক যে প্রচেষ্টা এসেছে এই বড়ি শিল্পে সে বিষয়ে তাঁর সমর্থন রয়েছে - কিন্তু তিনি কখনোই একে নিয়ে ব্যবসা করার কথা 'ভাবেন নি - ভাবেনও না'।

শিল্পীর ভাষায় -

''বড়ি তৈরি করি ভালোবেসে। তাছাড়া বড়ি আমাদের পরিবারের লক্ষীশ্রী।''

শীতের মরশুমে প্রায় ৪০-৫০ কেজি ডালের বড়ি দেন। সারা বছর ধরে তা সংরক্ষণ করে রেখে দেন এবং আতিথি গেলে আপ্যায়নে বড়ি তো থাকবেই। শিল্পীর পরিবারে যারা এই শিল্পের সাথে যুক্ত তারা হলেন ননদ কাকলী সামন্ত, শিখা সামন্ত, দেওর তরুণ সামন্ত, অতনু সামন্ত কন্যা অনুরূপা সামন্ত, পুত্রবধূ অর্পিতা বেরা সামন্ত এছাড়াও স্বামী অজয় সামন্ত ও পুত্র অরুনাভ সামন্তর বিশেষ সহযোগিতায় শিল্পী এখনো শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন। শিল্পীর পরিচালনায় ও তার পরিবারের একান্ত সহযোগিতায় বেহালায় তপোবন ক্লাবে যে পূজামন্ডপ তৈরি হয় সেটি ই-টিভি মহালয়া ফেরি বেস্ট থিম ২০০৩ পুরষ্কার পায়। রোটারি শারদ সম্মান-এ ভূষিত হয়। তমলুক ফ্লাওয়ার্স এসোসিয়েশনে শিল্পীর তৈরি বড়ির প্রদর্শনী হয় এবং সেখান থেকে বহু গুণী মানুষের প্রশংসা তিনি পান। যাদের প্রশংসা শিল্পীর কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ তাঁরা হলেন কবি নিত্যপ্রিয় ঘোষ (শঙ্খ ঘোষের ভাই), শিল্পি রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় শিল্পীর শিল্পকর্ম নিয়ে বিশেষ রচনা প্রকাশিত হয়। ২০১৩ সালে কৃষ্ণপুর সেন্টার ফর ফোকলোর স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের 'লোকরত্ন' পুরস্কারে ভূষিত করেন।

এই ভাবেই গয়না বড়ি শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন শিল্পী পাবর্তী সামন্ত এবং এও চাইছেন শিল্পের সার্বিক প্রচার ও প্রসারলাভ হোক।

শিল্পীর হাতের গয়না বড়ি

গয়নাবড়ি দিচ্ছেন শিল্পী মীরা মাইতি

শিল্পীর নাম: মীরা মাইতি

ঠিকানা: অজয় মুখার্জী সরণি,
হরির বাজার (এল, আই, সির বীপরিতে)
তমলুক - পূর্ব মেদিনীপুর
স্বামীর নাম - নারায়ন মাইতি
বয়স - ৬৮ বর্তমান (৭২বছর)

পূর্ব মেদিনীপুরের প্রখ্যাত বড়ি শিল্পী মীরা মাইতি, গয়নাবড়ি শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। হাওড়ার মেয়ে মীরা দেবীর বিয়ে হয় তমলুকের গৌরাঙ্গপুর গ্রামে। মাত্র ষোল বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। বলা যায় তার হাত ধরেই নারায়ন মাইতির পরিবারে ঢুকল গয়নাবড়ি।

মীরা দেবীর এই শিল্পের সাথে ময়না গড়ের বহুবলীন্দ্র পরিবারের যোগ রয়েছে। এইখান থেকেই এই শিল্পের শিক্ষা নেন মীরা দেবী। মীরা দেবীর দিদির বিয়ে হয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার রাজবাড়িতে। সেখানে দিদির কাছে খুব ভাল করে কাজটি শেখে। দিদি বাপের বাড়িতে এলে এবং উৎসব অনুষ্ঠানে যখন ময়না থেকে গয়নাবড়ির তত্ত্ব আসত তখন সেই শিল্পকর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং দিদির কাছ থেকেই তিনি এই শিল্পটিকে করায়ত্ত করে ফেলেন। শিল্পীর ভাষায় -

> ''বড়ি দেওয়া শিখতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। মেলা সময়ও লাগেনি। কারণ আলপনাটা আমি ভালোই দিতাম - বড়িতে প্যাঁচটাই আসল - সেইটি শিখলে আর সব মনের ব্যাপার''।

তারপর থেকেই গয়নাবড়ি দেওয়া যেন অভ্যেস-নিয়ম-ভাললাগায় পরিণত হয়েছে। শিল্পী মীরা দেবীর বড়ি বহু প্রশংসা পায়। স্বামী নারায়ন মাইতি তাকে একান্তভাবে সাহায্য করেন। খড়গপুর খাদ্য মেলায় (আই.আই.টি আয়োজিত) বড়ির প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন (১৯৯৭)। কলকাতায় বহুপ্রদর্শনী, মেলায় তিনি অংশগ্রহন করেন। বহুল প্রচারিত সংবাদ পত্রগুলিতে বড়িশিল্পী হিসাবে তার নাম বারবার উল্লেখিত হয়।

তার উল্লেখযোগ্য কাজ হল গয়নাবড়ির প্রথম ছবি সমৃদ্ধ একটি বই তিনি প্রকাশ করেন এবং তমলুক নন্দন নামে একটি বড়ি বিক্রয় কেন্দ্রের তিনি কর্ণধার। সেখানে শুধুমাত্র বড়িই বিক্রি হয়। বলা যায় মীরা দেবীর হাত ধরেই গয়নাবড়ির একটি ব্যবসায়িক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয়। বহু

মহিলা শিল্পী এনার সাহচর্যে থেকে গয়নাবড়ির অর্ডার নিয়ে 'নন্দনে' অর্ডার সাপ্লাই করেছে। এতে বহু মহিলার অন্নসংস্থানও হয়েছে। কোনরকম আর্থিক সাহায্য ছাড়াই মীরা দেবী এবং তার স্বামীর একক প্রচেষ্টায় 'নন্দন' বড়ি বিপনীর জন্ম। শুধুমাত্র ভালোলাগা বা শখ বা অবসর বিনোদন নয় এর চেয়েও বেশি কিছু ভাবতে চেয়েছেন শিল্পি। বিয়েরতত্ত্বে বড়ি, উপহারের জন্য বড়ি এমনকি

শিল্পী মীরা মাইতির লিখিত বই

ক্যাটারিং ব্যবসায়ীরা গয়নাবড়ির অর্ডার দিত। কোলকাতা থেকে বেশ কয়েকটি ক্যাটারিং সংস্থা শীতের মরশুমে অর্ডার দিয়ে বড়ি বানিয়ে নিয়ে যেত।

'নন্দন' তমলুক এর মধ্যে এটি একমাত্র বড়ি বিক্রয় কেন্দ্র ছিল (২০০৩)। তবে ধীরে ধীরে এনারই প্রেরণায় বধূ শ্যামলী, মেয়ে ইন্দিরাও বড়ি দেওয়া শিখেছে কিন্তু তার মত ধৈর্য্য নেই। এই কারণেই ভাল শিল্পীর অভাব হয়ে পড়েছে। শিল্পীর ভাষায় -

> ''এখনকার মেয়েরা বড়ি দিতে চায় না - এর জন্য যে ধৈর্য্য, যে সময় দরকার তা এখনকার মেয়ে-বউদের নেই . . . ''

তার সাথে কথা বলতে বলতে জানা গেল বড়ি প্রগতির পথে বাধা হল 'স্পন্ডেলাইসিস' নামক ঘাড়ের ব্যথা। অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে হাতের কাজও যেমন নিঁখুত হয় তেমনিভাবেই ঘাড়ের ব্যথা, চোখের ব্যথা, হাতের ব্যথা মাথা চারা দিয়ে ওঠে। বড়ি দেবার ইচ্ছা থাকলেও শরীর বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রকৃত গয়নাবড়ি শিল্পীর অভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পীর নাম যশ সবই হয়েছে, কিন্তু সরকারী অর্থানুকূল্য কখনোই জোটে নি। তবে আগামী দিনে তার শিল্পকে ধরে রাখার মত যোগ্য কোন শিল্পী তিনি পাননি।

গয়নাবড়ি তৈরির ক্ষেত্রে তিনি রঙের ব্যবহার বহুল পরিমাণে করেছেন। রঙের বাহারে - নক্সার সুষমায় বড়ি তখন শুধু খাদ্যবস্তু নয় - শিল্পবোধ মিলেমিশে একাকার। বাহারি নক্সা - ড্রইং রুমের শো-পিস হিসাবেও স্থান পায়।

বর্তমানে মীরা দেবীর বয়স ৭২ বছর। আগের মত বেশি পরিমাণে বড়ি হয়ত তিনি দিতে পারেন না কিন্তু তার ডিজাইন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বহু মহিলা বড়ি শিল্পের প্রতি আগ্রহি হয়েছে এবং তারা গয়নাবড়িকে ব্যবসায়িকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। মীরা দেবীর স্বামী নারায়ন চন্দ্র মাইতি স্ত্রীর এই শিল্পের প্রচার ও প্রসারে বিশেষভাবে আগ্রহী। তার কথায় -

''নন্দন আমাদের স্বপ্ন - যতদিন আছি এটা চালিয়ে যাব। এই শিল্পের প্রচার ও প্রসারই হল এর লক্ষ্য এবং এটাই আমার নেশা।''

শিল্পী না হয়েও পারিবারিক পরম্পরাকে ধরে রাখার এ এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মীরা দেবী এবং নারায়নবাবু দুইজনেই বৃদ্ধ - সংসারের সমস্তরকম কাজ তাদের হয়ে গেছে। কিন্তু এই দুইজনেরই বেঁচে থাকার আবলম্বন হল এই গয়নাবড়ি - বহু যশ, বহু খ্যাতি তিনি এর থেকে অর্জন করেছেন কিন্তু আক্ষেপ যোগ্য শিষ্য বা যোগ্য শিল্পী তিনি রেখে যেতে পারবেন না। তবুও এই স্বান্তনা এই ব্যবসায়িক একটা ভিত্তি তৈরি হওয়ায় কিছু অতি সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মহিলা এর থেকে উপকৃত হচ্ছে।

২০১১ ৪ই ফেব্রুয়ারী
শিল্পি: অনিতা খাটুয়া
স্বামী: অমিতাভ খাটুয়া
ঠিকানা; বেলদা, রাজবাজার,পশ্চিম মেদনীপুর
বয়স: ৫১

পশ্চিম মেদনীপুরের বেলদার অনিতা খাটুয়া বড়ি শিল্পী হিসাবে বিশেষ খ্যাত। তার হাতের গয়না বড়ি তার পরিবার পরিজনদের ভিতরে বিশেষ ভাবে জনপ্রিয়। শিল্পী কিন্তু একটু ব্যতিক্রমি শিল্পী। শিল্পীর বাপের বাড়ি পূর্ববঙ্গীয় সেখানে কিন্তু গয়নাবড়ি দেবার চল একেবারেই নেই। আমরা জানি পূর্ব বঙ্গীয় ও পশ্চিম বঙ্গীয় এই দুই জনজাতির মধ্যে খাদ্যাভ্যাস এবং আচার বিচারে বিস্তর পার্থক্য। এক বাড়ির আচার আচরণ অন্য বাড়ির সাথে একে বারেই মেলে না ।

বড়ি শিল্পের হাতেখড়ি কিন্তু তার শ্বশুর বাড়ি থেকেই। প্রথমে সহকারি হিসাবে বড়ি দেওয়ায় সাহায্য করতেন। বেলদায় শ্বশুরবাড়ি হলেও গ্রামের বাড়ি কাঁথিতে, সেখানে গেলেই বড়ি দেওয়ের কাজ বেশি হতো। সেখানে কাকিশাশুড়ি এবং শাশুরির হাতেই তার শিলপের হাতে খড়ি। এই বড়ি দেবার জন্য ডাল বাটাও কিন্তু খুবই কষ্টসাধ্য কাজ, শিল্পীর ভাষায়-

''মা কাকিমাকে আগে কলাই বেটে দিতাম ওটাই ছিল আমার কাজ।''

সহকারি হিসাবে কাজ করতে করতেই একদিন পাকা শিল্পী হয়ে উঠলেন আগে গয়নাবড়ি দেওয়া দেখেননি। সে যাইহোক পরম্পরা মানুষ কে নিজের করে নেয় এখানে হয়ত সেটাই ঘটেছে। ধীরে ধীরে প্যাচ শিখে নিয়ে তারপর গয়নাবড়ি দেবার পালা। শেখার জন্য 'লেই' নষ্ট করা তখন কার দিনে ভাবাই যেত না - তাই বড়ি দেওয়া হয়ে যাবার পড় যেটুকু থাকত সবার শেষে তাই দিয়েই চলত 'হাত ঘুরানোর' পালা। শিল্পীর ভাষায় -

''মা কাকিমাদের বড়ি দেওয়া হয়ে গেলে সবার শেষে আমি আর আমার ননদ মিলে হাত ঘুরিয়ে ছোট ছোট জিলিপি বড়ি দিতাম।''

কোন দিনই ব্যাবসায়িক ভাবে বড়ি দেবার কথা ভাবেননি । কারন বর্ধিষ্ণু পরিবারের গৃহবধূ হওয়ার দরুন পরিবারে বড়ি শুধু মাত্র আত্মীয় স্বজনদের উপমার ও নিজেদের খাওয়ার জন্য করা হয়। বেলদার অবাঙালিদের বসবাস প্রচুর তাদের মধ্যে ও শিল্পীর বড়ির বিশেষ চল রয়েছে। শীতের মরশুমে অনেক অবাঙালী মেয়েরা আগে শেখার জন্য এবং শিল্পীর কাছ থেকে নিয়ে যায় গয়নাবড়ি ভেজে খাওয়ার জন্য শিল্পীর ভাষায়-

''অনেক অবাঙালীদের মধ্যে এখন গয়নাবড়ি দেবার ও খাবার চল হয়েছে। শীত এলেই শেখার জন্য ও আসে। আবার বাড়ি গিয়ে বানিয়েও দিতে হয়।''

শিল্পীর নাম- বনানী ভৌমিক
স্বামীর নাম - স্বরূপ ভৌমিক
ঠিকানা - রথতলা, কাঁথি,
পূর্ব মেদিনীপুর
বয়স - ৪৩

গয়নাবড়ি দিচ্ছেন শিল্পী বনানী ভৌমিক

পূর্ব মেদনীপুরের কাঁথির দিমানেন্দু বেরার মেয়ে বনানী, মা আভারানী বেরার কাছ থেকেই গয়নাবড়ির দেওয়া শিখেছেন। তবে এখন তিনি যে একজন দক্ষ শিল্পী হয়েছেন তা কিন্তু শ্বশুরবাড়ি এসেই। একাধারে তিনি কাঁথির মেয়ে এবং অপরদিকে বউ। কাঁথিতে গয়নাবড়ির একটা নিজস্ব ঘরানা রয়েছে প্রায় সবাই কম বেশি বড়ি দিতে পারে। বেরা পরিবারের চেয়ে ভৌমিক পরিবারে বড়ি দেবার চলটা বেশী। তাই শ্বশুরবাড়িতে এসেই বনানী দেবীর বড়ি দেবার উৎকর্ষতা বেড়েছে।

খুব কম বয়সে শ্বশুরবাড়ি আসার পর কাকিশাশুড়ি রাধারাণী ভুঁইয়ার কাছে আরো ভালো করে কাজটি শিখেছেন।

ভুঁইয়া পরিবারে বড়ির নিজস্ব একটা ঘরানা রয়েছে। শিল্পী প্রতিনিয়তই নতুন নতুন করে গয়নাবড়ি শিল্পর মধ্যে আধুনিকতা সংযোজন ঘটানোর চেষ্টা করছে। বনানীদেবীর বাপের বাড়িতে শুধু মাত্র গয়নার আদলেই গয়নাবড়ি তৈরি হতো। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে এসে গয়নাবড়ির নতুন নতুন ডিজাইন তৈরি করা শেখে, শিল্পীর ভাষায় -

> ''আমি আমার শাশুড়ি কে দেখতাম তাঁতের শাড়ির পাড় থেকে নক্সা দেখে বড়ি দিতেন।''

এ বিষয়ে উল্লেখ্য পাড়ের নক্সা বা কোন জায়গা থেকে নেওয়া নক্সার হবহু গয়না বড়িতে রূপ পায় না। গয়নাবড়ির মধ্যে যে নক্সা কে ফুটিয়ে তোলা যায় সেটাই নেওয়া হত। তবে বড়ি দিতে দিতে অনেক রকমের 'টেকনিক'এমনি এমনিই শিল্পী শিখে যায়। অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে সুন্দর শিল্প সৃষ্টির মাপকাঠি। আগে শুধুমাত্র প্যাঁচের বড়িই দিতেন শিল্পী কিন্তু ধীরে ধীরে এর মধ্যে অনেক সংযোজন করেছেন। কাঁটা প্যাচ, কাটাবুটি, ইত্যাদি দিয়ে নতুন নতুন ডিজাইন তৈরি করেন।

শিল্পীর তৈরী গয়নাবড়ি

তাই ট্রাডিশনাল গয়নার ডিজাইনের বড়ি ছাড়াও শিল্পের হাতের ছোঁয়ায় রূপ পায় বহু নতুন নতুন ডিজাইন। যা গয়নাবড়ির সৌন্দর্যকে আরো বৃদ্ধি করে। কাঁথিতে অনেকেই ব্যাবসায়িক ভাবে গয়নাবড়ির উৎপাদন করে থাকে। কিন্তু এই শিল্পীর বৈশিষ্ঠ্য শুধুমাত্র বিশেষ ভাবে অর্ডার দিলেই তার তৈরি গয়নাবড়ি পাওয়া যায়। কল্যাণী ইউনিভারসিটির লোকসংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত লোকশিল্পের একজিভিশনে শিল্পীর তৈরি বড়ি বিশেষ সমাদর পায়। শিল্পী ভবিষ্যতে তার শিল্পকে লোক সম্মুখে আনার জন্য বার বার সরকারের কাছে আবেদন করলেও ফলপান নি। তিনি কিন্তু এখনো আশাবাদী যে কাঁথা শিল্পের মতো এই শিল্পের ও প্রচার হবে।

গয়নাবড়ি দিচ্ছেন শিল্পী অঞ্জলী ভুঁইয়া

শিল্পীর নাম : অঞ্জলী ভুঁইয়া
স্বামীর নাম : স্বরূপ ভোমিক
ঠিকানা : রথতলা, কাঁথি, পূর্ব মেদনীপুর
বয়স : ৬৫ বছর
পেশা : দারোয়া গাছি স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়

এগরা থানার চিরুলিয়া গ্রামের মেয়ে অঞ্জলী ভুঁইয়া ছোট

বেলা থেকেই মা কাকিমাকে বড়ি দিতে দেখেছেন। এখানে কাকিমা সুবোধবালা দাস তার শিক্ষা গুরু তারা বাপের বাড়ির পরিবারে কাকিমার হাত ধরেই বড়ি শিল্পের আগমন। এবং শিল্পীর কথায় -

> ''মা বড়ি দিতেন কিন্তু কাকিমার কাছেই গয়নাবড়ির হাতেখড়ি। কাকিমার যা খুব সুন্দর বড়ি দিতেন সেখান থেকেই কাকিমা শিখেছেন। আর আমি কাকিমার কাছ থেকে।''

প্রথম দিকে শিল্পী যখন বড়ি দেওয়া সবে শিখেছেন তখন শুধু মাত্র গয়নার আদলেই বড়ি দেওয়া হতো । শিল্পীর মা দিতেন শুধু মাত্র আড়াইপ্যাঁচের বড়ি। শিল্পীর কাঁথি শহরে বিয়ে হয়ে আমার পর শাশুড়ি শান্তশীলা ভুঁইয়ার সাহচর্যে বিশেষ ভাবে চর্চা শুরু করেন । শীতকাল এলেই আত্মীয় সজন পাড়া পড়শীর মেয়ে বউরা মিলে বড়ি দেবের ধুম পড়ে যেত এই বাড়িতে।

শিল্পীর হাতের গয়নাবড়ি

শিল্পী নিজে একজন শিক্ষিকা, তিনি সমস্ত কাজ সামলে শীতকালে বিশিষ্ঠ মানুষ জনের বিশেষ অনুরোধে বড়ি তৈরি করে দিতেন। আশাপূর্না দেবী একবার তার বড়ির বিশেষ প্রশংসা করেন। তাঁকে একটি প্রশংসাপত্র ও লিখে ছিলেন কিন্তু সেইটি র কোন হদিশ পাওয়া যায় না। শিল্পীর কথায় -

> ''আশাপূর্ণা দেবী আমার দেওয়া বড়ির প্রশংসা করেন। একটি প্রশংসা পত্র ও আসে আমার নামে। কিন্তু তখন সেটার মর্ম বুঝতে পারিনি তাই যত্ন নেইনি।''

স্কুলের প্রদর্শণী ও পৌরসভা কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনিং এ কাঁথি এলাকায় গয়না বড়ির একটা উচ্চ স্থান ছিল আর সেখানে শিল্পী অঞ্জলী ভুঁইয়ার তৈরি বড়ির বিশেষ কদর। কাঁথি পৌরসভার অধিনে গয়নাবড়ি কেন্দ্রিক কর্মশালায় শিল্পী প্রশিক্ষক হিসাবে বহুবার কাজ করেছেন।

শিল্পীর এই গয়নাবড়ি তৈরি কিন্তু নিজের একান্ত ভালো লাগা থেকে। তিনি কখনোই এই শিল্পের ব্যাবসা ভিত্তিক প্রসার চান নি। বরং তিনি চেয়েছেন মেয়েরা নিজে শিখে নিজে তৈরি করুক। তিনি নতুন নতুন ডিজাইন তৈরি করেছেন-তার কাছ থেকে তার মেয়ে, বউমা, জা এর বউমা সবাই শিখেছে। এবং বর্তমানে অনেক এর থেকে রোজগার ও করেছেন।

শিল্পী জানান যার আলপনা, সেলাই, আঁকা সম্পর্কে ধারনা আছে যে ভালো গয়না বড়ি দিতে পারে। তিনি অনেক ডিজাইন সেলাই এর বড়, চাদরের কলকা, শাড়ির পাড় থাকে নিয়েছেন-তিনি চান আরো মেয়েরা এই শিল্প শিখুক। শিল্পীর কথায় -

> ''আমার কাছে আজও অনেকে আসে। ডিজাইন শেখার জন্য। অনেকে পয়সা নিয়ে শেখায়। কিন্তু আমি নিজের মনের আনন্দে শেখাই, আর গয়না বড়ি দেই।''

সমস্ত শিল্পেরই নিজস্ব একটা রীতি থাকে তাকে আয়ত্ত্ব করতে পারলেই শিল্পকে আয়ত্তে আনা যায়। এই শিল্পে কোন মন্ত্রের প্রয়োজন হয় না শুধু প্রয়োজন মনের অনাবিল আনন্দ হৃদয়ের পারঙ্গমতা- এই শিল্পের সৌন্দর্য্যের মূলচাবিকাটি যে সৌন্দর্য্য বোধ তা শিল্পীদের কথায় বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু কথা উল্লেখ করা যায় - তিনি বলেছেন -

> ''কুমোর তাঁতি এরা অনেক খানি যন্ত্রের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে কাজ করে যায় -না করে তার উপায় নেই - কিন্তু পুতুলগড়বার বেলায় কুমোরের ব উ শুধু হাতেই নানান খেলনা গড়ে চলে.....ক্রিয়ার যান্ত্রিকতা সেখানে যেটুকু বা থাকে সেটা আন্তরিকতায় ঢাকা পড়ে যায়.....।'' [১৮]

গয়নাবড়ি ঠিক এমনি একটা শিল্প যেটা কিনা শিল্পীর মনের একান্ত অনুভূতি দিয়ে আন্তরিকতার সাথে তৈরি হয় । ক্ষেত্রসমীক্ষা করার সময় অনেক শিল্পীরই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সবাই কিন্তু প্রকৃত গয়নাবড়ি শিল্পী নন। অনেকে আছেন দিতে হয় তাই দেয়। যারা এই খাদ্য বস্তুর মধ্যে শিল্পের আভাস পান। সেই সমস্ত শিল্পীর সাক্ষাৎকার এখানে সন্নিবেশিত করা হল।

শিল্পীকে গয়নাবড়ি দিতে সাহায্য করছে পুরুষ সহযোগী

গয়নাবড়ি শিল্পীরা সকলেই নারী। তবুও অনেক জায়গায় পুরুষদের দেখা যায় সহযোগী হিসাবে কাজ করতে । শিল্পে ব্যবসায়িক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর অনেক মেয়েরা বড়ির মরসুমে সংসারে বাড়তি আয় করেন। এবং সারা বছর ধরে সেই আয় এর সংস্থানের জন্য শীতের মরশুমে অধিক পরিশ্রম করে সারা বছরের বড়ি তৈরি করে রাখে। তখন দেখা যায় স্বামীরা সহযোগিতা করেন। ডাল কেনা, মেশিনে পেশা ,ডাল ফেটানো ,প্যাকেজিং, মার্কেটিং ইত্যাদি কাজে পুরুষদের ভূমিকা অস্বীকার করলে চলবে না।

কিন্তু ব্যাতিক্রম যে নেই সে কথা স্বীকার করতে ই হয়। যেমন বাজকুলের তরুন সামন্ত, অতনু সামন্তর, কাঁথির দেবব্রত অধিকারী, কথা বলতেই হয় কারন তরুন সামন্ত, অতনু সামন্তের একান্ত সহযোগীতায় কলকাতায় সুবিশাল গয়নাবড়ির মন্ডপ তৈরি হয়। এরা প্রতক্ষ্য ভাবে গয়নাবড়ি দেন।

আবার কেউ কেউ আছেন স্ত্রীর সুন্দর শিল্প কর্মটিকে বাঁচিয়া রাখায় নিরলস প্রচেষ্টা করে যান। এক্ষেত্রে যার কথা না উল্লেখ করলেই নয় তিনি হলেন প্রখ্যাত বড়ি শিল্পি মীরা মাইতির স্বামী নারায়ণ চন্দ্র মাইতি। স্ত্রীর সুন্দর শিল্প কর্ম কে সর্ব সম্মুখে আনার নিরলস প্রচেষ্টা তিনি শুরু থেকেই করে যাচ্ছেন। তার সহযোগিতাতে 'নন্দন' নামে একটি গয়না বড়ির দোকান তমলুক শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার তার অক্লান্ত পরিশ্রমে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বড়ি শিল্পের প্রচার সম্ভব। এখনো এই ঊনোআশি (৭৯) বছর বয়সে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই শিল্পের প্রচার ও প্রসারে। শিল্পী মীরা মাইতি নিজেও অনেক বয়স হয়েছে। তবুও শিল্পের প্রতি টান কিন্তু কারোই কমেনি । নারায়ণ চন্দ্র মাইতি নিজে খুব বড় শিল্পী নন। তবে গয়নাবড়ি দিতে পারেন - পারিবারিক পরম্পরায় তার শিক্ষা । তবে গয়নাবড়ি শিল্পের প্রতি যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ভালোলাগা, তা সবাই কে মুগ্ধ করে। তিনি গয়নাবড়ির প্রথম বই প্রকাশেও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন তারই কর্ম দক্ষতায় বইটির প্রকাশ ঘটে। তিনি এই শিল্পের প্রচারে জন্য টুকরো টুকরো ছড়া বেঁধেছেন-

* আতিথেওতায় নক্সা বড়ি
আভিজাত্যের নেইকো জুড়ি।
* চায়ের সঙ্গে নক্সা বড়ি
আতিথেয়তার নেইকো জুড়ি।
* উপহারে নক্সাবড়ি
সাফল্য আনে পরোপুরি।
* খুকুর মন কেন ভারী
পাতে নেই যে গয়নাবড়ি।
* মেয়ে যাচ্ছে শ্বশুর বাড়ী
সঙ্গী হল গয়নাবড়ি।
* বুড়ো বুড়ির নেইকো দাঁত
মাড়ীর চাপে বড়ি কাত।

* গয়নাবড়ি এতই পলকা

তেল যোগাতে পকেট হাল্কা।[১৯]

তিনি চান গয়নাবড়ি একটা অর্থকরি শিল্প হোক। ময়েরা এর মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজেপাক। কিন্তু ভবিষ্যতে প্রকৃত শিল্পির অভাব যে হবে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তার কথায়-

> ''এখন কার মেয়েদের সময় নেই।শীতের সকালে উঠে এই পরিশ্রমের কাজ করতে চায় না- শিখতে চায় না। বড়ি না দিলে হাতের ডিজাইন ভালো হবে কি করে?''

এখন সরকারি অনুদানে অনেক ইউনিট তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেখানকার বড়ি কতটা শিল্প সুষমাসজ্জিত বা এর মধ্যে কতটা খাদ্যগুন রয়েছে এ ব্যাপারে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন এই ভাবে এই শিল্পের প্রসারে আগেই অপপ্রচার হবে। কারণ গয়নাবড়ি শিল্প পুরোটাই মেদিনীপুর কেন্দ্রিক এর ফলে বিভিন্ন জেলের মানুষের সম্মুখে প্রকৃত শিল্পটি যাবার আগে গুনগতমান কম এমন গয়নাবড়ি গেলে এর অপপ্রচার ই হবে। তাই এই শিল্পের একান্ত শুভাকাঙ্খী রূপে তিনি আবেদন করেন-

> ''যারাই এই গয়নাবড়ি শিল্প কর্মের সাথে যুক্ত তারা যেন এর শৈল্পিক গুন এবং খাদ্য গুন দুটো বিষয়ে নজর দেন।তা না হলে শিল্পের অপপ্রচার ঘটবে।''

নারায়ন চন্দ্র মাইতির কথাটি বিশেষ ভাবে গ্রহনযোগ্য। যে কোন শুভানুধ্যায়ী এ বিষয়টিকে সর্বাত্মকরণে সর্মথন করবেন, তার এই যে প্রচেষ্টা অনেক শিল্পী এবং লোকশিল্প প্রেমীদের উৎসাহ প্রদান করে।

ঠিক তেমন ভাবেই - উল্লেখ করা যায় বাজকুলের পার্বতী সামন্তর স্বামী আজয় কুমার সামন্তর কথা। শিল্পীকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা যুগিয়ে এসেছে তার স্বামী। স্ত্রীর প্রত্যেকটি কাজে তিনি রীতিমতো উৎসাহ দিয়ে গেছেন। এর জন্যই বহু এ্যকজিভিশন ,বহু মেলায় তার কাজ বহু গুণীজনের প্রশংসা পেয়েছে। শিল্পীর 'বড়ি মাসি' হয়ে ওঠার পিছনে তার স্বামীর প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য।

অতএব এই কথা বলাই যায় একান্ত মেয়েলী শিল্পরূপে খ্যাত এই গয়নাবড়ি শিল্পের সমৃদ্ধির পিছনে বহু পুরুষ শুভানুধ্যায়ী এর একান্ত প্রচেষ্টা রয়েছে। এইখানেই শিল্পটি কোথায় যেন 'মেয়েলী' তকমা কে অতিক্রম করে সার্ব্বজনীন রূপে পেয়েছে। শিল্প কখনই একমুখী হতে পরে

না তার মধ্যে যে সার্ব্বজনীন ভাব মূর্তি রয়েছে তারই বৈশিষ্ট্য ক্রমান্বয়ে গয়নাবড়ি শিল্পকে বিকশিত করেছে। নন্দলাল বসুর কথায় বলা যায় - ''বঙ্গ মাতার ঝাঁপিতে এ এক অমূল্য রতন''

গয়না বড়ির শিল্পীর মধ্যে প্রভেদ রয়েছে - ১) স্বত:স্ফূর্ত ও অপেশাদার। ২)অভ্যাসগত পেশাদার। এই দুয়েরই সংমিশ্রনে গয়না বড়ির শৈল্পিক পরম্পরা এগিয়ে চলে। এই শিল্পের পরম্পরা গত ভিত্তি ছিল স্বত:স্ফূর্ত ও অপেশাদার শিল্পিদের মনোনিবেশ। কারন সম্ভ্রান্ত ঘরের বউ-ঝি এরা তাদের মনের স্বত:স্ফূর্ত ভাবাবেগে হৃদয়ের মুর্ছণায় তাদের একান্ত অবসরে বানিয়ে ফেলতেন একের পর এক সুন্দর কারুকার্য মন্ডিত গয়নাবড়ি। সেখানে কিন্তু ডালের পরিমান,সময় লাভের কথা চিন্তা করা হত না শুধু দেখা হত শৈল্পিক গুনগত মান ও খাদ্য গুনগত মান। ফলে শিল্পের উৎকর্ষতা বা ভাব গভীরতা বিশেষ ভাবে বজায় থাকত। (আজও রয়েছে যেখানে পেশাদারিত্ব ঢোকে নি।) অভ্যাসগত ও পেশাদার শিল্পীরা ভাবেন এর অর্থকরী দিকটি ফলে অনেক সময় গয়নাবড়ি শিল্প শৈল্পিক গুন হারিয়ে ফেলে। বাজার চলতি হয়ে যায়। যখনই বাজার চলতি গয়নাবড়ি লোক সম্মুখে আসে তখন এর কদর কমে যায়। পেশাদারিত্ব একদিকে শিল্পীর কাছে যেমন উপকারি তেমনি অপকারিও বটে। ক্ষেত্রগুপ্তর একটি উক্তি বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হয় -

> ''..... লোকসৃষ্টির দুই ঘরানা স্বত:স্ফূর্ত ও অপেশাদার এবং অভ্যাসগত ও পেশাদার। অবশ্য এই দুই মহলে যাতায়াত ও আছে। গুনাগুন বিচারে এই প্রভেদ মনে করে রাখতে হয়।''[২০]

মহিলা শিল্পী

অতীত থেকে বর্তমান

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	অঞ্চলস্থান	উৎপাদনের রূপ
১.	শরৎ কুমারী দেবী - ক		গ্রাম - লক্ষ্যা, তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
২.	হিরন্ময়ী দেবী - খ		গ্রাম - লক্ষ্যা, তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৩.	সেবা মাইতি - গ		গ্রাম - লক্ষ্যা, তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৪.	রানী চন্দ - ঘ		তমলুক (শহর) পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৫.	রেনুকা মন্ডল - ঙ		তমলুক (শহর) পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৬.	বন্দিতা মন্ডল (দরবার)		ময়না, শ্রীরামপুর, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৭.	রঞ্জিতা মন্ডল (ভৌমিক)		মহিষাদল, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৮.	সুরমা দেবী		মহিষাদল, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৯.	বিন্ধ্যবাসিনী - চ		গ্রাম -দাসপুর, ঘাটাল, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
১০.	সতীরানী - ছ		ময়নাগড়, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
১১.	মিনতি গাঁতাইত		ময়নাগড়, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
১২.	মীরা মাইতি - ট		গৌরাঙ্গপুর তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৩.	ইন্দিরা জানা		গৌরাঙ্গপুর তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৪.	নীলিমা জানা		ঘঞ্চী তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৫.	বসুন্ধরা জানা		তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৬.	শিখা ভৌমিক		তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৭.	মুকুলিকা মাইতি		তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৮.	গীতা বহুবলীন্দ্র - জ		তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৯.	প্রতিমা বহুবলীন্দ্র -ঝ		ময়নাগড়, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	অঞ্চলস্থান	উৎপাদনের রূপ
২০.	উষারাণী চক্রবর্তী		তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	ব্যবসায়িক
২১.	দীপালি রায়		নাড়াদাড়ি, পূর্বমেদিনীপুর	ব্যবসায়িক
২২.	মাধবীলতা মাইতি		তমলুক (উপেন্দ্র কুটির), পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
২৩.	নিভাননী পট্টনায়ক ঞ		তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
২৪.	বিন্ধ্যবাসিনী মহাপাত্র		মহিষাদল, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
২৫.	নির্মলা দাস		কাপাস এড়্যা, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
২৬.	শক্তিরানী সামন্ত		নাড়াদাড়ি, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
২৭.	বিজয়লক্ষী মাইতি		যাদপুর তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
২৮.	সান্তনা মাইতি		বাসুদেবপুর তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
২৯.	স্বতী মাইতি		ময়না বলাই পান্ডা, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৩০.	বিজয়া মাইতি		কালাগেছিয়া কাঁথি, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৩১.	ভগবতী দাস	৫৫	পায়রাডুঙ্গি তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	ব্যবসায়িক
৩২.	পারমিতা দাস	৩০	পায়রাডুঙ্গি তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	ব্যবসায়িক
৩৩.	সংঘমিত্রা দাস	৩৫	পায়রাডুঙ্গি তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৩৪.	অনিতা সিংহ	৬৫	আবাসবাড়ি তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	ব্যবসায়িক
৩৫.	তপতী দাস	৩৫	আবাসবাড়ি তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	ব্যবসায়িক
৩৬.	শ্রীমতী পুষ্প দাস	৬০	আবাসবাড়ি তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৩৭..	শেফালী দাস	৪০	আবাসবাড়ি তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৩৮.	পল্লবী জানা	৩০	আবাসবাড়ি তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৩৯.	পুস্প দাস	৬০	চঙ্গড়া ময়না, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৪০.	অনুভা জানা	৩০	হাড়ি বেড়্যা হলদিয়া, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক

৪১.	গীতা বেরা	৪৭	হাড়ি বেড়্যা হলদিয়া, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৪২.	সোমা মাঝি	২৭	হাড়ি বেড়্যা হলদিয়া, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৪৩.	রেবা দাস	৩২	হাড়ি বেড়্যা হলদিয়া, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৪৪.	মায়া মাইতি	৪৫	টাউনসিপ হলদিয়া, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৪৫.	বেবি খাটুয়া	৪০	টাউনসিপ হলদিয়া, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৪৬.	ঝুমা খাটুয়া	৩০	টাউনসিপ হলদিয়া, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৪৭.	অঞ্জলী মাইতি	৪৫	টাউনসিপ হলদিয়া, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৪৮.	আভা মাজি	৪৮	দুর্গাচক কলোনী মার্কেট হলদিয়া, পূর্বমেদিনীপুর	ব্যবসায়িক
৪৯.	টুসী মাজি	৩৯	দুর্গাচক কলোনী মার্কেট হলদিয়া, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৫০.	সঙ্গীতা মাইতি	২৫	চৈতন্যপুর দাড়িব্যড়া সুতাহাটা, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৫১.	পার্বতী সামন্ত - ন	৬৫	কাখুরিয়াবাড়ি, বাজকুল, পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৫২.	দীপালী প্রধান	৪৫	গ্রা:+পো: দূর্গাচক কলোনী মার্কেট থানা হলদিয়া, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক
৫৩.	বিজলী পাত্র	৩৫	গ্রা:+পো: সুতাহাটা পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৫৪.	শীতলাময়ী গুড়িয়া	৩৮	গ্রা:+পো: সুতাহাটা পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৫৫.	ঋতুপর্ণা গুড়িয়া	৩৫	গ্রা:+পো: সুতাহাটা পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৫৬.	ব্রজলীলা মাইতি	৬৫	গ্রা:+পো: সুতাহাটা পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৫৭.	রঙ্গনা মাইতি	২৫	গ্রা:+পো: সুতাহাটা পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৫৮.	যোগমায়া মন্ডল	৭২	গ্রা:+পো: সুতাহাটা পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৫৯.	ঝর্ণা মন্ডল	৩৫	গ্রা:+পো: সুতাহাটা পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৬০.	সাবিত্রী প্রামানিক	৬০	গ্রা:+পো: সুতাহাটা পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৬১.	রীতা ভৌমিক	২৮	গ্রাম+পো:-রঙ্গীবসান মহিষাদল, জেলা: পূর্ব মেদিনীপুর	ব্যবসায়িক
৬২.	ইন্দিরা জানা	৪০	গ্রাম+পো:-মহিষাদল, তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর	পারম্পরিক

৬৩.	আর্পিতা মেট্যা	৩০	পায়রাডুঙ্গি তমলুক	পারম্পরিক
৬৪.	শ্যামলী মাইতি	৩৬	এল, আই, সি, মোড় তমলুক	ব্যবসায়িক
৬৫.	মন্দিরা প্রামাণিক	৪০	কুমারগঞ্জ তমলুক	ব্যবসায়িক
৬৬.	মণি মাইতি	৩৫	গৌরাঙ্গপুর তমলুক	ব্যবসায়িক
৬৭.	অঞ্জলী মাইতি	২৮	গৌরাঙ্গপুর তমলুক	ব্যবসায়িক
৬৮.	অপর্ণা মাইতি	২৫	গৌরাঙ্গপুর তমলুক	ব্যবসায়িক
৬৯.	মায়া মাইতি	১৮	গৌরাঙ্গপুর তমলুক	ব্যবসায়িক
৭০.	বিদিশা মাইতি	৩০	গৌরাঙ্গপুর তমলুক	পারম্পরিক
৭১.	অন্বেষা মাইতি	২৪	গৌরাঙ্গপুর তমলুক	পারম্পরিক
৭২.	প্রিয়াঙ্কা জানা	৪৬	গৌরাঙ্গপুর তমলুক	পারম্পরিক
৭৩.	অনন্যা মাইতি	৫০	এল, আই, সি, মোড় তমলুক	পারম্পরিক
৭৪.	সরস্বতী মাইতি	৪০	জেলখানা মোড় তমলুক	পারম্পরিক
৭৫.	বিপুলা মাইতি	৪১	জেলখানা মোড় তমলুক	পারম্পরিক
৭৬.	গোপা প্রধান	৩০	গ্রাম আটিলগুড়ি কাঁথি- পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৭৭.	বৈশালী প্রধান	৩২	গ্রাম আটিলগুড়ি কাঁথি- পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৭৮.	স্বপ্না মাল	৪২	রথতলা কাঁথি	পারম্পরিক
৭৯.	কুসুম মাল	৪৫	রথতলা কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৮০.	পুতুল মাল	৪২	রথতলা কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৮১.	ঝুনু মাল	৩২	রথতলা কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৮২.	কৃষ্ণা মহান্তি	৪৫	হাতাবাড়ি রথতলা কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৮৩.	বনানী ভৌমিক - ঠ	৪৫	হাতাবাড়ি রথতলা কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	ব্যবসায়িক
৮৪.	চিন্ময়ী কামিল্যা	৬০	কুমরপুর কলাই -পুর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৮৫.	মৌলি কামিল্যা	৩৮	কুমরপুর কলাই -পুর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক

৮৬.	রেনুকা অধিকারি	৪০	হাতাবাড়ি রথতলা কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৮৭.	সুস্মিতা অধিকারি	৩৪	হাতাবাড়ি রথতলা কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৮৮.	সাবিত্রী মিত্র রায় ড	৫৫	হাতাবাড়ি রথতলা কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৮৯.	সুধীরা মিত্র ঢ	৮১	কিশোগড় কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৯০.	সুমিতা মাইতি	৩০	রাউতারা পো : ধানগাঁ কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৯১.	পুস্প মাইতি	৫৫	রাউতারা পো : ধানগাঁ কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৯২.	হেমলতা মাইতি	৪৭	রাউতারা পো : ধানগাঁ কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৯৩.	দীপশিখা মাইতি	৩২	রাউতারা পো : ধানগাঁ কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৯৪.	স্বান্তনা মাইতি	৪৫	রাউতারা পো : ধানগাঁ কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৯৫.	ইন্দিরা মাইতি	৩৮	রাউতারা পো : ধানগাঁ কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৯৬.	হারামনি মাইতি	৪৫	রাউতারা পো : ধানগাঁ কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৯৭.	খুকুমনি মাইতি	৪১	রাউতারা পো : ধানগাঁ কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৯৮.	রুনি সাঁতাইত	৪৮	রাউতারা পো : ধানগাঁ কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
৯৯.	অনিমা চন্দ্র	৪৫	গ্রাম: অমরশী, পো: পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১০০.	রাধারাণী চন্দ্র	৬৫	গ্রাম: অমরশী, পো: পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১০১.	তপতি চন্দ্র	৩৫	গ্রাম: অমরশী পো: পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১০২.	সোমা চন্দ্র	৩২	গ্রাম: অমরশী পো: পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১০৩.	পিউ চন্দ্র	৪০	গ্রাম: অমরশী পো: পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১০৪.	টুম্পা চন্দ্র	৪১	গ্রাম: অমরশী পো: পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১০৫.	দেবলীনা চন্দ্র	২৮	গ্রাম: অমরশী পো: পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১০৬.	বনলতা চন্দ্র	৩৫	গ্রাম: অমরশী পো: পটাশপুর পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১০৭.	লিপি চন্দ্র	৩৮	গ্রাম: অমরশী পো: পটাশপুর,	পারম্পরিক

১০৮.	সুমিতা কমিল্যা	৭০	রাজাবাজার, পো: কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১০৯.	সুলতা কমিল্যা	৫৫	রাজাবাজার, পো: কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১১০.	চিলু কমিল্যা	২৮	রাজাবাজার, পো: কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১১১.	বন্দনা মাইতি	৪০	আটলাকুড়ি, কাঁথি, পূ:মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১১২.	গীতা চন্দ্র	৪১	পালপাড়া আমরসী, থানা-পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১১৩.	রঞ্জনা দে	৪২	ডুমুরদাড়ি, পো: বরবরিয়া, থানা - ভগবানপুর, পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১১৪.	বিপাশা দে	৩৫	ডুমুরদাড়ি, পো: বরবরিয়া, থানা - ভগবানপুর, পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১১৫.	নমিতা দে	৩০	ডুমুরদাড়ি, পো: বরবরিয়া, থানা - ভগবানপুর, পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১১৬.	বসুন্ধরা দে	২৫	ডুমুরদাড়ি, পো: বরবরিয়া, থানা - ভগবানপুর, পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১২৮.	চৈতালি মিশ্র	৫৫	গ্রাম:শিমুলিয়া, থানা-ভগবানপুর, জেলা-পূ:মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১২৯.	নুপুর খাটুয়া	৬৫	গ্রাম-উরুড়ী, থানা-ভঘবানপুর, জেলা-পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৩০.	বৈশাখী বেরা	৪৫	গ্রাম:ডুমুরদাড়ি, থানা-ভূপতিনগর, জেলা-পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৩১.	রীনা হাজরা	৩৫	গ্রাম:ডুমুরদাড়ি, থানা-ভূপতিনগর, জেলা-পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৩২.	বীনা মাইতি	৪৭	গ্রাম:বড়বড়িয়া, থানা-ভূপতিনগর, জেলা-পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৩৩.	শিখা মাইতি	৫৫	গ্রাম:খটিয়াল, থানা:ভূপতিনগর, জেলা-পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৩৪.	মায়া দে	৪৪	গ্রাম:বাগদাচি, থানা:ভূপতিনগর, জেলা-পু: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৩৫.	রোজ মল্লিক	৪১	গ্রাম:মনহরচক, থানা-কাঁথি, জেলা-পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৩৬.	অনুভা মল্লিক	৫৮	গ্রাম:মনহরচক, থানা-কাঁথি, জেলা-পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৩৭.	নিলীমা প্রধান	৩৭	গ্রাম:আটিলাগুড়ি, থানা:কাঁথি, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৩৮.	রানু পাল	৫০	গ্রাম:সুজনপুর, থানা-রামনগর	পারম্পরিক
১৩৯.	তপতী প্রধান	৩০	গ্রাম:সোনাকনিয়া, থানা-রামনগর, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক

১৪০.	বীনা প্রধান	৫৫	গ্রাম:সোনাকনিয়া, থানা-রামনগর, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৪১.	কিরণ বালা ভুঁইয়া	৭৫	গ্রাম:বেতনটি, থানা-রামনগর, জেলা-পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৪২.	বিনাপানী সাউ	৬৫	গ্রাম:মিরগোলা, থানা-দীঘা, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৪৩.	পৌলমী গিরি	৩৭	গ্রাম:বধিয়া, থানা:দীঘা, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৪৪.	মিনতি দে	৫৮	গ্রাম:পালপাড়া, থানা-ভগবানপুর, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৪৪.	কাকলী চন্দ	৩২	গ্রাম:মোংগলামাড়ো, থানা-পটাশপুর, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৪৫.	সন্ধ্যা দাস	৪৬	গ্রাম:সিংদা, থানা-পটাশপুর, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৪৬.	সন্ধ্যা দাস	৬৮	গ্রাম:আমর্ষি, থানা-পটাশপুর, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৪৭.	দীপিকা হাজরা	৩৮	গ্রাম:ভীমেশ্বরী, থানা-পটাশপুর, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৪৮.	মিতালী পড়্যা	৪৫	গ্রাম:রাধাপুর, থানা-ভূপতিনগর, জেলা-পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৪৯.	সুবীরা দে	৫১	গ্রাম:ইটাবেরিয়া, থানা-পটাশপুর, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৫০.	মিনতী প্রামানিক	৪৮	গ্রাম:পচেটগড়, থানা-পটাশপুর, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৫১.	লেখা দাস	৩৫	গ্রাম:প্রতাপদিঘী, থানা:ভূপতিনগর, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৫২.	সর্বজয়া মাইতি	৫৫	গ্রাম:উদবাদলা, থানা:ভূপতিনগর, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৫৩.	পর্ণা দাস	৪০	গ্রাম:চিনাদাড়ী, থানা:ভগবানপুর, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৫৪.	রাধারানী কামিল্যা	৩২	গ্রাম:রাধাপুর, থানা:ভূপতিনগর, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৫৫.	প্রমিলা মান্না	৬৫	গ্রাম:কাঠপুলবাজার, থানা:রামনগর, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৫৬.	বিনোদিনী মাইতি	৪৮	গ্রাম:মন্দারমণি, থানা:রামনগর, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৫৭.	শিখা মল্লিক	৫১	গ্রাম:দীঘা(পুরাতন), থানা:দীঘা, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৫৮.	মানসি বর	-	গ্রাম:শঙ্করপুর, থানা:দীঘা, জেলা:পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৫৯.	মৌমিতা প্রধান	-	গ্রাম:কুদি, থানা-এগরা, জেলা-পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক

১৬০.	চিত্রলেখা ভুঁইয়া	-	গ্রাম:হেড়িয়া, থানা-বাজকুল, জেলা-পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৬১.	অর্পিতা পাল	-	গ্রাম:নন্দীগ্রাম, থানা-নন্দীগ্রাম, জেলা-পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৬২.	মিনু সাহু	৫৫	-গ্রাম:তমলুক, থানা-তমলুক, জেলা-পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৬৩.	তপতি বেরা	-	গ্রাম:হাকোলা, থানা-তমলুক, জেলা-পূ: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৬৪.	মিনতি কানুঙ্গ	৬৮	গ্রাম:বেলদা(বাদল সিনেমা রোড), থানা-বেলদা, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৬৫.	রিনু দাস	৪৫	গ্রাম:বেলদা(বাদল সিনেমা রোড), থানা-বেলদা, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৬৬.	গীতা মিশ্র	৪৮	গ্রাম:বেলদা(পুরাতন কাঁথি রাস্তা), থানা-বেলদা, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৬৭.	রুনুঝুনু ঘোষ	৩০	গ্রাম:বাখরাবাদ, থানা-বেলদা, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৬৮.	সুমীতা দাস	২৮	গ্রাম:বাখরাবাদ, থানা-বেলদা, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৭০.	মৌমিতা ত্রিপাঠী	৩৩	গ্রাম:নারায়নগড়, থানা-নারায়নগড়, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৭১.	সুচেতা ত্রিপাঠী	৩৫	গ্রাম:নারায়নগড়, থানা-নারায়নগড়, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৭২.	কনক পাল	৪০	গ্রাম:হাঁন্দলা, থানা-নারায়নগড়, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৭৩.	বিশাখা পোদ্দার	-	গ্রাম:সোনাঝারি, থানা-নারায়নগড়, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৭৪.	কিরণলেখা চক্রবর্তী	-	গ্রাম:বেনাডিহা, থানা-নারায়নগড়, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৭৫.	রাধা রায়	-	গ্রাম:রানীসরাই, থানা-বেলদা, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৭৬.	আনিতা দাস	-	গ্রাম:বাবলপুর, থানা:দাতন, জেলা:প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৭৭.	গোপারানী পাল	-	গ্রাম:ডহরপুর, থানা:নারায়নগড়, জেলা:প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৭৮.	মিতা চক্রবর্তী	-	গ্রাম:খেলাড়, থানা:খড়গপুর, জেলা:প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৭৯.	বিরাজ মাইতি	৫২	গ্রাম:মেদিনীপুর টাউন সিপাইবাজ, থানা:মেদিনীপুর, জেলা:প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৮০.	মৌসুমী দে	৪৫	গ্রাম:মেদিনীপুর টাউন গোলকুঁয়াচক, থানা:মেদিনীপুর, জেলা:প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৮১.	মৌসুমী গিরি	৫০	গ্রাম:মেদিনীপুর টাউন গোলকুঁয়াচক, থানা:মেদিনীপুর, জেলা:প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক

১৮২.	সুস্মিতা গোষ	৫১	গ্রাম:সোনাকায়া, থানা-দাঁতন, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৮৩.	শিখা মন্ডল	৬০	গ্রাম:মেদিনীপুর টাউন বাচ টাউন, থানা-মেদিনীপুর, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৮৪.	সুদেষ্ণা সাউ	৩১	গ্রাম:শ্যামচক, থানা:খড়গপুর, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৮৫.	ভগবতী দাস	৪১	গ্রাম:কেশীয়াড়ী, থানা:কেশিয়ারী, জেলা:প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৮৬.	বিমলা সাউ	৬০	গ্রাম:চাতুড়ীভাড়া, থানা-নারায়নগড়, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৮৭.	সুমনা মন্ডল	-	গ্রাম:শালজোড়া, থানা-বেলদা, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৮৮.	রানী বোস	-	গ্রাম:বামরাবদ, থানা-নারায়নগড়, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৮৯.	প্রতিমা কুইলা	৩২	গ্রাম:কুচলী, থানা-নারায়নগড়, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৯০.	স্বাতী নন্দ	৪৫	গ্রাম:রেল কলোনী, থানা-খড়গপুর, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৯১.	সুধা মল্লিক	৪৮	গ্রাম:বেলদা হোস্টেল রোড, থানা-বেলদা, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৯২.	নন্দিনী সামন্ত	৩৮	গ্রাম:খাকুড়দা, থানা-বেলদা, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৯৩.	অনিন্দিতা মাইতি	৫২	গ্রাম:খাকুড়দা, থানা-বেলদা, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৯৪.	সুজাতা বেরা	৪৫	গ্রাম:খাকুড়দা, থানা-বেলদা, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৯৫.	বাসন্তী মান্না	৪৯	গ্রাম:বেলদা সবুজপল্লি, থানা-বেলদা, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৯৬.	তিতির কামিল্যা	৩৩	গ্রাম:বেলদা নতুন ভি ডি ও অফিসরোড, থানা-বেলদা, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক
১৯৭.	নবনিতা রায় মহাপাত্র		গ্রাম:বেলদা রাজাবাজার, থানা-বেলদা, জেলা-প: মেদিনীপুর	পারম্পরিক

বিশিষ্ট শিল্পীদের পরিচয় সূচী

ক. রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা ধন্য
খ. তদেব
গ. তদেব
ঘ. নন্দলাল বসুর প্রশংসা ধন্য
ঙ. অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষের প্রশংসা ধন্য
চ. ঐতিহ্যশালী ময়নাগড় রাজ পরিবারের বধূ।
ছ. তদেব
জ. ঐতিহ্যশালী ময়নাগড় রাজ পরিবারের সদস্যা।
ঝ. তদেব
ঞ. ডঃ বিধানরায়ের প্রশংসা ধন্য
ট. গয়নাবড়ি বিষয় প্রথম বই এর লেখিকা।
ঠ. ফোক আর্ট অ্যান্ড ক্রাপ্ট এক্সিভিশন ও সেমিনার, কল্যাণী লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ প্রশংসিত।
ড. রাজা যাদব রাম রায়ের বংশ ধর, ইংরেজ আমলে গয়নাবড়ি তৈরি করে বহু প্রশংসা পেয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র

১) বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দ কোষ, সাহিত্য আকাডেমি, ১৯৬৬

২) দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯

৩) ঘোষ, অনিলচন্দ্র, ব্যবহারিক শব্দকোষ, বাংলা ভাষায় অভিনব অভিধান, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি

৪) বসু, রাজশেখর, নতুন বাঙ্গালা অভিধান, কলিকাতা, ১৩৪৪

৫) রায়, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, বাঙ্গালা শব্দকোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা

৬) দেব, আশুতোষ, নতুন বাঙ্গালা অভিধান, কলিকাতা, ১৩৪৪

৭) বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র, কবিকঙ্কন চন্ডী,'নদিয়ার মনের কথা', কলকাতা ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯২৫, পৃ. ২৭৯

৮) বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র, কবিকঙ্কন চন্ডী, 'হরগৌরীর কলহারম্ভ', কলকাতা ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯২৫, পৃ. ২০৯

৯) ড. করণ অধ্যাপক, বঙ্গবাসী মহাবিদ্যালয়, প্রাতঃ বিভাগ

১০) সাক্ষাৎকার শিল্পী শুভ্রাপ্রসন্ন রায়

১১) গুপ্ত, ক্ষেত্র। লোকসৃষ্টির নন্দন তত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ২০০২, পৃ.২০

১২) চট্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৪

১৩) তথ্যদাতা - অঞ্জলী ভূঁইয়া, ঠিকানা- রথতলা, কাঁথি, পূর্ব মেদনীপুর, পঃবঃ

১৪) মাইতি, প্রকাশচন্দ্র, মেদনীপুর জেলার প্রস্তর যুগের নিদর্শণ: একটি আলোচনা, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪১০, পৃ. ৬১

১৫) চক্রবর্তী, নিবেদিতা, 'পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক পরম্পরায় কাঁসা পিতল শিল্প'পি. এইচ.ডি. গবেষণা পত্র, ২০১১, পৃ ৬১

১৬) মাইতি, প্রদ্যোতকুমার, মেদনীপুরের লোকসংস্কৃতি, পূর্বাদি প্রকাশনী, মেদনীপুর, ২০১১, পৃ. ২

17) Fish Farms Development Agency, Midnapur 1986 Inlan Fisheries project- A Guide to its execution, p.p. 15-16

১৮) ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, শিল্পীর ক্রিয়াকান্ড (প্রবন্ধ), আনন্দ পাবলিশার্স,কলকাতা, ১৯৪০, পৃ ১১৩

১৯) নন্দন বড়ি শিল্পীর লিফলেট, প্রকাশক, নারায়ণচন্দ্র মাইতি, তমলুক, মেদনীপুর।

২০) গুপ্ত, ক্ষেত্র, লোকসৃষ্টির নন্দন তত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ,কলকাতা, ২০০২, পৃ.৪৪